॥ श्रीहरिः ॥

1838▲

জীবন যাপনের শৈলী

जीवनोपयोगी प्रवचन (बँगला)

গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচীপত্র

——o——

দিয়েছেন ! এই গ্রন্থটির মধ্যে সাধক খুঁজে পাবেন দিশা, সাধারণ সংসারী মানুষ পাবেন আলো। এই অমূল্য গ্রন্থটির মূল্য তাই অপরিসীম।

আজকের এই কলুষিত যুগে গীতাপ্রেস এই অনুপম গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে আপামর বঙ্গভাষী মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। দিক্‌ভ্রান্ত মানুষ, শান্তিকামী মানুষ, কল্যাণকামী মানুষ— প্রত্যেকেই এই মহীরুহসম গ্রন্থের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে শান্তি লাভ করবে, সঠিক দিশার সন্ধান পাবে এবং নিজেদের কল্যাণ সাধনে নিরত হতে পারবে— এই আশা পোষণ করি। এই ধরনের গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অত্যন্ত বিরল এবং দুর্লভ।

এই মহৎ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের কাজে যুক্ত হতে পেরে এই দীন অনুবাদক নিজেকে ধন্য এবং কৃতার্থ মনে করছে। এই অধমের অক্ষম অনুবাদের ভুল ত্রুটি যেন সকলে ক্ষমা করেন এবং আমাকে অবগত করান, সহৃদয় পাঠকের কাছে বিনীতভাবে এই অনুরোধ করি।

গীতাপ্রেসের কাছে বঙ্গভাষীরা চিরঋণী হয়ে থাকবেন। আমি এই প্রার্থনা করি যেন আপামর বঙ্গভাষী জনসাধারণের কাছে অচিরেই এই গ্রন্থটি গ্রহণীয় এবং বরণীয় হয়ে ওঠে।

বিনীত

মহাষ্টমী ১৪১৫ সুপ্রতীক বন্দ্যোপাধ্যায়

এইরকমভাবে আমাদের শরীর থেকেও দেবতারা দুর্গন্ধ পেয়ে থাকেন। তাঁদের দেহ এমনই দিব্য ! আমাদের শরীরে পৃথ্বী-তত্ত্বের প্রাধান্য। দেবতাদের শরীরে তেজস-তত্ত্বের প্রাধান্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈশ্বরলাভের অধিকার যতটা মনুষ্যশরীরধারীরা লাভ করেন, ততটা তাঁরা লাভ করেন না। এইজন্যই মনুষ্য শরীরের এত মহিমা !

উত্তরকাণ্ডে শ্রীকাকভূশণ্ডিকে গরুড় প্রশ্ন করেছেন সব থেকে উত্তম দেহ কোন্‌টি ? তার উত্তরে বলেছেন— মনুষ্য শরীর সব থেকে উত্তম, কারণ '**নর তন সম নহিঁ কবনিউ দেহী। জীব চরাচর জাচত জেহী**॥' চর-অচর সকল জীব এই মনুষ্য-শরীরকে যা করেন, আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। এই কথা বলার পর বলছেন—

নরক স্বর্গ অপবর্গ নিসেনী। গ্যান বিরাগ ভগতি সুভ দেনী॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১২০।৫)

মনুষ্য-দেহ নরক, স্বর্গ এবং অপবর্গ (মোক্ষ)— এই তিনটি প্রদান করে থাকে। এছাড়া পরমাত্মার জ্ঞান, সংসারের প্রতি বৈরাগ্য এবং ভগবানের প্রতি শ্রেষ্ঠ ভক্তিও এই শরীরে লাভ হতে পারে। এই প্রকার ছয়টি কথা এই শরীর সম্বন্ধে জানিয়েছেন। মনুষ্য-শরীর একটি বড় সন্ধিস্থল (রেলের জংশনের মত)। এখান থেকে নানা দিকে যাওয়া যায়। মনুষ্য-শরীরের এমনই মহিমা এই মহিমার কথা জানিয়ে বলা হয়েছে—'**নরক স্বর্গ অপবর্গ নিসেনী**'। নরকে যেতে পারে— এটা মহিমা না নিন্দা ! মনুষ্য-শরীর এমন, যাতে নরক লাভ হতে পারে—এইটা তো হল নিন্দা। তাহলে এর তাৎপর্য কী হল ? এই মানব-শরীর দ্বারা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম এবং নীচ থেকে নীচতম বস্তু লাভ করা যেতে পারে। এইটা এর মহিমা।

বাস্তবিকপক্ষে মহিমা হল এই মানব দেহের সদুপযোগের। যদি এর সঠিকভাবে উপযোগ করা যায় তাহলে ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তি, মুক্তি, বৈরাগ্য লাভ করা যায়, সমস্ত কিছু লাভ করা যায়। এমন কোনো বস্তু নেই যা মনুষ্য-শরীর দ্বারা লাভ করা যায় না। গীতাতে আছে—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ॥ (গীতা ৬।২২)

যা লাভ করার পর অন্য কোনো লাভ অবশিষ্ট থাকে না এবং তা অপেক্ষা অধিক কোনো লাভ হতে পারে বলে মনেও আসে না এবং তাতে স্থিত হলে মহাদুঃখও তাকে বিচলিত করতে পারে না। কোনো কারণবশতঃ যদি শরীরকে টুকরো-টুকরো করা হয়, তবুও আনন্দ হয়, শান্তি হয়, স্ফূর্তি হয়। দুঃখের দ্বারা সে বিচলিত হতে পারে না। তার আনন্দে কখনো কোনও ন্যূনতা আসতে পারে না।

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্। (গীতা ৬।২৩)

এত আনন্দ হয় যে দুঃখ সেখানে থাকতেই পারে না, মানব-শরীর দ্বারাই এমন অবস্থা প্রাপ্ত করা যেতে পারে। তত্ত্ব-প্রাপ্তির যোগ্যতা আছে বলে মনুষ্য-শরীরের তাই এত মহিমা। মনুষ্য-শরীর লাভ করে ঠিক এইভাবে তত্ত্বকে অনুভব করা উচিত। তত্ত্বকে প্রাপ্ত না করে মিথ্যা, কপটতা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, পাপ কাজের দ্বারা নরকে যাওয়ার প্রস্তুতি করলে সেটা হবে সত্যই মহা দুঃখের ব্যাপার !

এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে মনুষ্য-শরীর লাভ করা গেছে। এখন যাতে নরকে না যেতে হয়। চুরাশী লক্ষ যোনী আর না পরিভ্রমণ করতে হয়। নীচ যোনিতে কেন যাব ? চুরি করলে, হত্যা করলে, ব্যাভিচার করলে, হিংসা করলে, অভক্ষ-ভক্ষণ করলে, নিষিদ্ধ কাজ করলে মানুষ নরকে যেতে পারে। এত সুন্দর সুযোগ ভগবান দিয়েছেন যে দেবতারা পর্যন্ত যা লাভ করতে পারে না, এমন উঁচু স্থান এই জীবনেই লাভ করা যেতে পারে। প্রাণ থাকতে থাকতে ঈশ্বর লাভ হতে পারে। শান্তি, প্রসন্নতা এবং আনন্দ—এই শরীরেই লাভ হতে পারে। মানব-শরীরে এমন প্রাপ্তির সুযোগ আছে। এইজন্য এর মহিমা। একে (মানবশরীর) পেয়েও যে নীচ কাজ করে, সে খুব বড় ভুল করে থাকে।

কোনো শ্রেষ্ঠ বস্তু পাওয়া গেলে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। যেমন কেউ পরশপাথর পেয়ে যদি তা দিয়ে লোহাকে স্পর্শ করে, তাহলে লোহা সোনা হয়ে যাবে। এখন, যদি এমন পরশপাথর দিয়ে কেউ বসে মশলা পেষাই করে, তাহলে কী করা যাবে ? সেই পরশপাথর তো মশলা পেষাই

করার জন্য মোটেই নয়। পরশ পাথর দিয়ে শুধু মশলা পেষা নয়, কেউ যদি নিজের মাথাও ফাটায়, তাহলে তাতে পরশপাথরের কী দোষ ? ঠিক এইরকমভাবে মানব-শরীর লাভ করে তার দ্বারা পাপ, অন্যায়, দুরাচার করে নরকে যাওয়া হল, নিজের মাথা ফাটানোর সামিল। সংসারের ভোগে নিযুক্ত হওয়া, এটা হল পরশ পাথর দিয়ে মশলা পেষাই করা।

ভোগ কোথায় না পাওয়া যাবে ? বরাহের একসঙ্গে দশ-বারোটি শাবক হয়। অতএব একটি-দুটি সন্তান উৎপাদন করে ফেলেছ তো কি এমন বড় কাজ করেছ ? কোন্ বিশাল কাজ করে ফেলেছ ? ধন উপার্জন করেছ তো কোন্ বড় কাজ করে ফেলেছ ? সাপের বিলে অনেক ধন থাকে। ধনকে জড়িয়ে সাপ বসে থাকে। ধন তো তার কাছেও আছে। অর্থ রোজগার করে কী এমন মস্ত কাজ সিদ্ধ করে ফেলেছ ? আয়েশ-আরামের মধ্যে সুখ দেখে আর ভাবে এই সুখ ভোগ করে নেওয়া যাক্। বোম্বাইতে আমি এমন কুকুর দেখেছি, যাদের খুব আরামের মধ্যে প্রতিপালন করা হয়। বাইরে গেলে তো মোটর এবং এরোপ্লেনে এদের নিয়ে যাওয়া হয়। এই সব কুকুরদের মতন এত আরাম মানুষের মধ্যেও খুব কম লোকের ভাগ্যে জোটে। ভাগ্যে থাকলে তো কুকুরও তা পেতে পারে। এগুলি কী এমন কাজ যার জন্য মনুষ্য-শরীরের অপব্যবহার করা হবে ! ভোগ্য ভোগের দ্বারা, সংসারের সুখ গ্রহণ করার দ্বারা, ধন অর্জনের দ্বারা, মনুষ্য-শরীর নষ্ট করা হলে সেটা হবে এক মারাত্মক ভুল। মিথ্যা, কপট, প্রবঞ্চনা করে মানুষ নরকে যাবার প্রস্তুতি করে, এটা হল মহা পতনের কথা। মানুষ কত দুর্লভ শরীর লাভ করেছে ! সেই শরীর পেয়ে তারা এমন কাজ করছে ! সুতরাং সাবধান হওয়া উচিত যে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর কাজ আমাদের সম্পন্ন করতে হবে, মহৎ থেকে মহত্তর কাজ আমাদের সম্পন্ন করতে হবে। অন্য কোনো যোনিতে এই কাজ হতে পারে না।

একটিমাত্র মনুষ্য-শরীরকৃত পাপ চুরাশী লক্ষ যোনিতে ভোগ হয়ে থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চার যুগ পার হয়ে যায়, চুরাশী লক্ষ যোনি এবং নরকের কুণ্ডে কষ্ট ভোগ করার পরও মনুষ্য-শরীর কৃত পাপ

শেষ হয়ে যায় না। মাঝখানে ভগবান কৃপা করে মনুষ্য-শরীর প্রদান করে থাকেন। সঞ্চিত পাপ আরো অবশিষ্ট থেকে যায়, ভোগ করার পরও সমস্ত পাপ শেষ হয় না ; এমন মহা পাপ আছে, যা এই মনুষ্য-শরীরে সৃষ্ট হয়। এই মনুষ্য-শরীর এমনই যার দ্বারা পরমাত্মাকে পাওয়া যেতে পারে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর স্ফূরণমাত্রে রচিত হয়, পালিত হয়, সেই পরমাত্মা তোমার আজ্ঞা পালন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। '**তাহি অহীর কী ছোহরিয়াঁ ছছিয়া ভরি ছাছ পৈ নাচ নচাবেঁ।**' সেই গোপীদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি সুগভীর প্রেম হওয়ায় তারা যখন বলেন— '**লালা ছাছ দুঁগী, থোড়া নাচো।**' তো ভগবান নাচতে শুরু করে দেন। '**লালা বংসী বজাও ছাছ পিলাউঁগী।**' এখন দ্যাখো দইয়ের মাঠার বিনিময়ে সেই পরমাত্মা নাচতে এবং বাঁশী বাজানোর জন্য প্রস্তুত ! এত উচ্চপদ এই মনুষ্য-শরীর দ্বারা লাভ করা যেতে পারে। এই শরীর লাভ করে যদি আমরা নরকের জন্য প্রস্তুত হই— মহা দুঃখের জন্য প্রস্তুত হই, তাহলে সেটা এক মস্ত বড় ভুল ! এমন মনুষ্য-শরীর লাভ করে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর সম্পদ (আত্মশক্তি) লাভ করা উচিত।

যেমন বৃন্দাবনে এসে ভগবানের দর্শন করো, যমুনাতে স্নান করো। সেখানকার বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসা করো যে সবচেয়ে বেশি লাভজনক কথা কী। সবচেয়ে পুণ্যদায়ক, উদ্ধারকারী বস্তু কোন্‌টি। যখন বৃন্দাবনে এসেছ, তখন বৃন্দাবনের আনন্দ নাও। এখন বৃন্দাবনে এসেও যদি নাটক, সিনেমা দেখো তাহলে কি সেটা ঠিক ? আরে ভাই ! এখানে কেন এসেছ ? মুম্বাই, কলকাতাতে অনেক ভালো সিনেমা দেখা যায়। এটা তো তীর্থস্থান। ভগবানের দর্শন করো। যেখানে কীর্তন হয়, কথা হয় এমন জায়গায় যাও এবং বিশেষ লাভ নিয়ে নাও। বৃন্দাবনে এসেছ না ? কিন্তু এখানেও সেই কাজ করে থাকো যা পশু-পক্ষীও করে থাকে, সেই খাওয়া-দাওয়া, সেই সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করা। এই সব তো ভাই কুকুর হয়ে গেলেও করা যাবে, শুয়োর হয়ে গেলে, গাধা হয়ে গেলে, কাক-শকুন হয়ে গেলেও করা যাবে। কোন জিনিসটা করা বাকী থাকবে ? এই সব জিনিসের জন্য কি মনুষ্য-শরীর নিয়ে এসেছ ? মনুষ্য-শরীর কেন নষ্ট করছ ? এই শরীর যখন

লাভ করেছ, ভগবান যখন কৃপা করে এমন শরীর দিয়েছেন তখন এই শরীরদ্বারা সেই দুর্লভ পরমাত্মাকে লাভ করো। রামায়ণে বলা হয়েছে—

বড়েঁ ভাগ মানুষ তনু পাবা। সুর দুর্লভ সব গ্রন্থহি গাবা॥ (৭।৪২।৪)

মনুষ্য-শরীর দেবতাদের পক্ষেও দুর্লভ, এমন কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এমন দুর্লভ শরীর, যা লাভ করে কেবল পরমাত্মা তত্ত্বের প্রাপ্তি করা উচিত। কেবল পরমাত্মতত্ত্বেই সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত হওয়া উচিত। সুযোগ লাভ করা গেছে ভাই ! যেমন মনুষ্য-শরীর দুর্লভ, তেমনি কলিযুগও দুর্লভ। কলিযুগের মত এমন সুযোগ অন্য যুগে পাওয়া যায় না। কলিযুগে এমন সুযোগ পাওয়া গেছে। সেই কলিযুগে জন্ম নিয়ে ভোগে, পাপে নিযুক্ত হলে, অন্যায়ে নিযুক্ত হলে ! শাস্ত্রের দৃষ্টিতে অন্যায়, বিচার করে দেখলেও অন্যায়, লৌকিক দৃষ্টিতেও অন্যায় যা লোকে জানতে পারলে লজ্জা হয় ! এমন-এমন কাজে নিযুক্ত হয়ে যায় মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত করে। কত ক্ষতিকর কথা ! এই অবস্থায় কী করা যায় !

আজকের দিন অবধি যা হয়েছে, তা হয়েছে। ভুল যদি হয়ে থাকে তো হয়েছে। আজ থেকে দৃঢ় নিশ্চয় করে নাও যে সময় নষ্ট করব না, পাপ এবং অন্যায় করব না। খুব শীঘ্র তত্ত্বের প্রাপ্তি কী করে হবে ? কি করে সেই তত্ত্বের বোধ হবে ? কীকরে ভগবৎ চরণে প্রেম হয়ে যাবে ? এই ধরনের তীব্র ব্যাকুলতায় নিমগ্ন হও।

প্রশ্ন—আমাদেরও কি প্রেম জাগ্রত হতে পারে ? এই শরীরের দ্বারা কি কল্যাণ হতে পারে ?

উত্তর— খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো। এই শরীর দ্বারাই উদ্ধার হতে পারে। সংসার চক্র থেকে আপনিও মুক্ত হতে পারেন। লাখপতি হওয়া আপনার হাতে নেই। প্রাসাদে বাস করা আপনার হাতে নেই। সংসারে যশ, প্রতিষ্ঠা, মান, আদর, সম্মান লাভ হওয়া, আপনার হাতে নেই। পরমাত্ম-তত্ত্বের প্রাপ্তি করা কিন্তু আপনার হাতে আছে। এই ব্যাপারে সকলেই স্বতন্ত্র। মানুষ মাত্রেই এই ব্যাপারে স্বতন্ত্র, কেউ পরতন্ত্র নয়, কারণ পরমতত্ত্ব লাভের জন্যই মনুষ্য-শরীর পাওয়া গেছে। পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তির

জন্যই মানব-শরীর পাওয়া গেছে। সুতরাং তা প্রাপ্ত করা হল একটি বিশেষ কাজ। কিন্তু এইদিকে মানুষ মনোযোগ দেয় না। রামায়ণে বলা হয়েছে—

কবহুঁক করি করুনা নর দেহী। দেত ইস বিনু হেতু সনেহী॥ (৭।৪৩।৩)

এই চৌপায়ীর প্রতি আপনি একটু মনোনিবেশ করুন। ভগবান বিশেষ কৃপা করে মানব-শরীর দিয়ে থাকেন। এর অর্থ কী হল ? ভগবান এই জীবের প্রতি বিশ্বাসবশতঃ এই নির্ণয় করেছেন যে একে মনুষ্য-শরীর প্রদান করা হোক, যার দ্বারা এর দুঃখ মিটে যাবে, আমার প্রাপ্তি হয়ে যাবে এবং এর কল্যাণ হয়ে যাবে। এই ভাবনা দ্বারা তিনি বিশেষ কৃপা করে মানব শরীর দিয়েছেন। যখন ভগবানের এইরূপ ভাবনা যে আমাকে লাভ করুক তখন আমরাও যদি এইদিকে একটু মনোযোগ দিই তাহলে ভগবানের সংকল্প সত্যে পরিণত হবেই, কিন্তু মানুষ তো এর প্রতি মনোযোগ দেয় না। ভগবান কৃপা করে মানব শরীর দিয়ে থাকেন—এর অর্থ হল এই যে এর দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি হতে পারে। ভগবান বিশ্বাস করেছেন তাই যদি এখানে এসে জীব ভগবানকে লাভ না করে, তাহলে সে ভগবানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এখানে এসে পাপ, মিথ্যা, কপটতাপূর্ণ আচরণ করলে মস্ত বড় লোকসান হয়।

সুতরাং নিশ্চয় করে নাও যে আজ থেকে আর পাপ করবে না, অন্যায় করবে না এবং ভগবৎতত্ত্বকে জানতে সচেষ্ট হবে। যেমন ব্যবসায়ী কেবল ব্যবসার সন্ধানে থাকে, সেইরকম ভাবে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির সন্ধানে নিযুক্ত হওয়া উচিত। যদি আপনি কোনো সন্ত, মহাত্মা পেয়ে যান, কোনো ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষ পেয়ে যান তাহলে তাঁকে জিজ্ঞেস করুণ ভগবানকে কী করে লাভ করা যাবে ? ভগবৎ চরণে প্রেম কেমন করে হবে ? জীবন্মুক্তি কেমন করে হবে ? এইরকম ব্যাকুলতা হলে পরে—

জেহি কে জেহি পর সত্য সনেহু। সো তেহি মিলই ন কছু সন্দেহু॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।২৫৮।৩)

সৎসঙ্গের মহিমা

প্রথম ভগতি সন্তন্‌হ কর সঙ্গা। (শ্রীরামচরিতমানস ৩।৩৪।৪)

প্রথম ভক্তি হল সন্ত-মহাত্মাদের সঙ্গ।

ভক্তি সুতন্ত্র সকল সুখ খানী। বিনু সৎসঙ্গ ন পাবহিঁ প্রানী॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৪।৩)

ভক্তি হল স্বতন্ত্র এবং সমস্ত রকম সুখের খনি। বলা হয়েছে—

সৎসঙ্গত মুদ মঙ্গল মূলা। সোই ফল সিধি সব সাধন ফূলা॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।২।৪)

সৎসঙ্গ হল সমস্ত রকম মঙ্গলের মূল কারণ। বৃক্ষে তো আগে মূল হয় এবং শেষে ফল হয়। কিন্তু সৎসঙ্গ হল একইসঙ্গে মূল এবং ফলের মতন। অন্যান্য সাধন হল ফুল এবং পাতার মতন যা মূল এবং ফলের মাঝখানে অবস্থান করে। সকল সাধনকে সৎসঙ্গের অন্তর্গত ধরা যেতে পারে। এইজন্য সৎসঙ্গের এত মহিমা।

সুন্দরদাসজী মহারাজ বলেছেন—

সন্ত সমাগম করিয়ে ভাঈ। যামেঁ বৈঠো সব মিল আঈ॥

সন্ত-সমাগম করা উচিত। এটা নৌকার মতন, যাতে বসে পার হয়ে যাবে। সৎসঙ্গ মনকে চন্দনের মতন পবিত্র করে এবং পরশপাথরের ন্যায় লোহাকে সোনায় পরিণত করে। সঙ্গসঙ্গের এমন মহিমা ! সুন্দরদাসজী মহারাজ আরও বলেছেন—

ঔর উপায় নহীঁ তিরনে কা সুন্দর কাঢহি রাম দুহাঈ॥

রামজীর দিব্যি দিয়ে বলেছেন যে, উদ্ধারের আর কোনো উপায় নেই। এইটি হলো অব্যর্থ উপায়। এইজন্য সৎসঙ্গে যদি টিকে থাকা যায় তাহলে উদ্ধার হয়ে যাবে। সৎ এর সঙ্গ করো। যেখানে ভগবানের চর্চা হয়, সৎ-চর্চা হয়, সৎ-চিন্তন হয়, সৎকর্ম হয় এবং সৎসঙ্গ হয়, সেখানে

সৎ এর সঙ্গে অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে যায়। শুধুমাত্র এর দ্বারাই জীবের উদ্ধার হতে পারে।

জীব যতসব দুঃখ পায়, তা সবই অসৎএর সঙ্গ থেকেই উৎপন্ন হয় এবং অবিনাশীর সঙ্গ করলেই সে উদ্ধার লাভ করে, কারণ সে তো ভগবানের অংশ।

ঈস্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখরাসী॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৬।১)

অতএব সৎসঙ্গের দ্বারা সৎএর প্রতি প্রেম জাগ্রত হলে সৎকে লাভ করা যায়। সৎসঙ্গ লাভ হলে, পরমাত্মার সঙ্গ লাভ হলে তো চিরতরে উদ্ধার হয়ে যাবে। যেখানে সৎএর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, তাকেই সৎসঙ্গ বলা হয়। ভগবানের সঙ্গে যে সঙ্গ হয়, তাকেই সৎসঙ্গ বলা হয়। প্রকৃত সৎসঙ্গ হয় অসৎকে ত্যাগ করলে। যদিও অসৎএর দ্বারাও সৎসঙ্গে সহায়তা লাভ হয় যেমন, সৎ-চর্চা করতে চাইলে বাণী ছাড়া কেমন করে করবে ? সৎ-কর্ম করতে চাইলে বাহ্যিক ক্রিয়া ছাড়া কেমন করে করবে ? সৎ-চিন্তন করতে চাইলে মন ছাড়া কেমন করে করবে ? কিন্তু প্রকৃত সৎসঙ্গে অন্য কারো সহায়তার প্রয়োজন হয় না, নিজেই নিজের সঙ্গে একাত্ম হবে, তন্ময় হয়ে যাবে। সৎসঙ্গ, সৎ চিন্তন, সৎকর্ম, সৎচর্চা এবং সদগ্রন্থের অবলোকন এসবের উদ্দেশ্য হল সৎসঙ্গ। সৎকে লাভ করার জন্য অসৎকে দূর করে দিলে সৎসঙ্গের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়।

'**সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ**।' অসৎ থেকে বিমুখ হলে সৎএর সঙ্গ লাভ হয়। অন্তর তো রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা ইত্যাদি আবর্জনায় পূর্ণ হয়ে আছে, যা সৎসঙ্গ হতে দেয় না। এইটা অনুভব করা যায় যে মানুষ চাইলে এইসব ত্যাগ করতে পারে ; কিন্তু তা খুব কঠিন বলে মনে হয় ; কতক্ষণ ? যতক্ষণ দৃঢ় নিশ্চয় না হয়। দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে গেলে তখন কঠিন বলে মনে হয় না। যা কিছু হোক না কেন, আমাকে তো এদিকেই যেতে হবে, এইভাবে দৃঢ় নিশ্চয় করা উচিত। তখন অনায়াসে সব কিছু হয়ে যায়।

মনের মধ্যে ঈর্ষা, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি দোষ পূর্ণ হয়ে আছে। অনেকে

তো এসম্বন্ধে অজ্ঞ কিন্তু যারা জানে তারাও এসবের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। কেউ-কেউ এসবের প্রতি সজাগ থেকে তা দূর করতে সচেষ্ট হন কিন্তু অন্তর থেকে এসবের দ্বারা সুখ আহরণ করতে থাকেন। সেইজন্য রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা ইত্যাদি দূর হয় না, কারণ অসৎএর সঙ্গ বজায় রাখা হয়।

সৎএর সঙ্গ (সৎসঙ্গ) লাভ হলে তো মানুষ ধন্য হয়। সৎ এর সঙ্গ হওয়া মাত্র সে ধন্য হয়ে যায়। এর কারণ কী ? কেননা পরমাত্মা হলেন সৎ। মাঝখানে যে সমস্ত অসৎ সম্বন্ধ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সে সবই হল প্রতিবন্ধক।

যেমন কল্পবৃক্ষের নীচে গেলে সব কাজ সিদ্ধ হয়, তেমনি সৎসঙ্গের দ্বারা সব কাজ সিদ্ধ হয়। অর্থ, ধর্ম, কাম, মোক্ষ— চারটি পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। তাহলে কি সৎসঙ্গের দ্বারা ধন লাভ হয় ? বলা হয়ে থাকে যে সৎসঙ্গের দ্বারা অনুপম ধন লাভ হয়। অর্থ লাভ হলে ভোগ তৃষ্ণা জাগ্রত হয়, এবং সৎসঙ্গ করলে তৃষ্ণার নিবারণ হয়। তখন টাকার প্রয়োজনই থাকে না।

গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥

গঙ্গায় স্নান করলে পাপ দূর হয় ; পূর্ণিমার দিনে চাঁদ পূর্ণরূপে উদয় হয়, সেইদিন তাপ (গরম) শান্ত হয়ে যায় ; কল্পবৃক্ষের নীচে বসলে দারিদ্র্য দূর হয়। কিন্তু সৎসঙ্গে তিনটি বস্তুই লাভ হয়—পাপ নষ্ট হয়, অন্তরের তাপ মিটে যায় এবং সংসারের দারিদ্র্য দূর হয়।

চাহ গই চিন্তা মিটী, মনুআ বেপরবাহ।
জিনকো কছূ ন চাহিয়ে, সো সাহন পতিশাহ॥

সৎসঙ্গের দ্বারা আকাঙ্ক্ষাও দূর হয়। এই কথাটা একেবারে সত্য এবং যেসব ভাইবোন সৎসঙ্গ করে থাকে তারা এই কথাটা জানে। এটা একেবারে খাঁটি কথা যে সৎসঙ্গের দ্বারা হৃদয়ের তাপ দূর হয়ে যায়।

মানুষ নানা কল্পনা করে— এরূপ হোক, এরূপ যেন না হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা হয়েছে—

মনা মনোরথ ছোড় দে তেরা কিয়া ন হোয়।
পানী মে ঘী নীপজে তো সূখী খায় ন কোয়॥

যদ্ভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোহয়মগদঃ কিং ন পীয়তে॥

যা হওয়ার নয়, তা হবে না এবং যা হওয়ার, তা পরিবর্তন করা যাবে না, তা হবেই। সুতরাং এমন আগ্রহ থাকা কেন যে, এটা হওয়া উচিত, এটা হওয়া উচিত নয়। অতএব যা ঘটে তাকে স্বাভাবিক মনে করো। সৎসঙ্গ একটি পাঠশালা। দুঃখ থেকে পার হওয়ার কৌশল সৎসঙ্গের মাধ্যমে লাভ হয়। যেমন সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির কাছে সাঁতারের কৌশল প্রাণরক্ষাকারী হয়, তেমনি সৎসঙ্গের মাধ্যমে যুক্তি লাভ হলে মানুষ ধন্য হয়ে যায়।

সৎসঙ্গের মাধ্যমে উত্তম বিচার লাভ হয়। জ্ঞানমার্গের ক্ষেত্রে তো এ পর্যন্ত বলা হয়েছে—

ধন কিস লিয়ে হ্যায় হৈ চাহতা, তূ আপ মালামাল হ্যায়।
সিক্কে সভী জিসসে বনেঁ, তূ বহ মহা টকসাল হ্যায়॥

সেই ধন থাকতে তুমি এই (পার্থিব) ধন কেন চাও ? তোমার কাছেই তো ধন আছে। সেই পরমাত্মা রূপ ধনে তুমি পরিপূর্ণ হয়ে আছ। সেই ধনে ধন্য হয়ে যাও। পরমাত্মার, সৎএর দর্শন—সৎসঙ্গের দ্বারা লাভ করা যায়।

সৎসঙ্গের একটিমাত্র বিষয়বস্তু, ভগবানের কথা। সেটাই বলা, শোনা, বোঝা, বিচার করা, চিন্তা করা। ভগবান যাকে কৃপা করেন, তাকে সৎসঙ্গ প্রদান করে থাকেন। সৎসঙ্গ লাভ হয়েছে, তার মানে ভগবানের রত্ন ভাণ্ডারের অমূল্য বস্তু লাভ করা গেছে। যে ভগবানের প্রিয় হয়, সে ভগবানের অন্তরে বাস করে। এই ধন হল হৃদয়ের ধন। মা-বাবা যে বালককে বেশি স্নেহ করেন, তাকে তাঁদের ধনভাণ্ডারের সন্ধান জানিয়ে দেন—পুত্র ! দেখ এই ধন আছে। এমনিভাবে ভগবান যখন খুব কৃপা করেন তখন তাঁর ভাণ্ডারের অমূল্য বস্তু (ধন) সন্ত-মহাত্মাদের প্রদান করে থাকেন—নাও পুত্র, এই ধন আমার কাছে আছে।

সৎসঙ্গ লাভ হলে বোঝা উচিত আমাদের উদ্ধার করার ইচ্ছা ভগবানের মনে বিশেষভাবে জেগেছে ; তা না হলে সৎসঙ্গ কেন দিয়েছেন ? আমরা তো স্বাভাবিকভাবেই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়ে রয়েছি, তিনি আমাদের সৎসঙ্গের সুযোগ কেন দিলেন ! তিনি এই ব্যবস্থা করেছেন আমাদের কল্যাণের জন্য। যার সৎসঙ্গ লাভ হয়েছে তার এটা বোঝা উচিত যে ভগবান তাকে আহ্বান করছেন, চলে এসো। প্রভু ডাকছেন, সুতরাং প্রেমপূর্বক সৎসঙ্গ করো, ভজন-স্মরণ করো, জপ করো। সৎসঙ্গ করার ব্যাপারে সকলে স্বতন্ত্র। সৎ পরমাত্মা সব জায়গায় উপস্থিত আছেন। সেই পরমাত্মা আমার এবং আমি তাঁর—এটি স্বীকার করে সৎসঙ্গ করলে ধন্য হয়ে যাবে।

সৎসঙ্গ হল কল্পদ্রুম। সৎসঙ্গ অনন্ত জন্মের পাপ ধ্বংস করে দেয়। সৎ এর দিকে অগ্রসর হওয়া মানে অসৎ নষ্ট হয়ে যাওয়া। অসৎ তো স্বতঃই নষ্ট হয়ে যায়। টিকে থাকতে পারে না। জীব অসৎকে আঁকড়ে রয়েছে। যদি সৎএর দিকে অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে অসৎএর অভাব হয়ে যাবেই। সৎসঙ্গ অজ্ঞানরূপী অন্ধকারকে দূর করে দেয়। মহান পরমানন্দ পদবী প্রদান করে। কি অপূর্ব ব্যাপার ! সৎসঙ্গ কি না করতে পারে ? সৎসঙ্গ সব কিছু করতে পারে। '**প্রসূতে সদ্‌বুদ্ধিম্‌**।' সৎসঙ্গ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি উৎপন্ন করে। বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যায়।

গোস্বামী তুলসীদাস লিখেছেন—

মজ্জন ফল পেখিঅ ততকালা। কাক হোহিঁ পিক বকউ মরালা॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।২।১)

সাধুসঙ্গরূপী প্রয়াগে ডুব দিলে তৎক্ষণাৎ ফল লাভ হয়। কাক কোকিলে পরিণত হয়, বক হাঁসে পরিণত হয়। অর্থাৎ সৎসঙ্গ করলে রং বদলায় না, ঢং বদলায়। যার বাণী কাকের মত সে কোকিলের মতো হয়ে যায়। যে বকের মতো, সে হাঁসের মতো নীর-ক্ষীর পৃথককারী হয়ে যায়। সৎসঙ্গের দ্বারা আচরণ এবং বিবেক তৎক্ষণাৎ বদলে যায়। সৎসঙ্গ লাভ হলে এসব বদলে যায়, যদি না বদলায় তাহলে হয়, যথার্থ সৎসঙ্গ লাভ

হয়নি অথবা সেটি আপনি গ্রহণ করেননি। দুটি একত্র হলে তবেই ফলপ্রসূ হয়। যেমন পরশপাথরের সংস্পর্শে এলে লোহা সোনা হয়ে যায়, কিন্তু দুয়ের মাঝখানে যদি কিছু রেখে আলাদা করা হয় তাহলে হবে না।

ভগবান এবং সন্ত-মহাত্মাদের প্রতি নিষ্কাম প্রেমের ভাব রাখা উচিত। ভগবান মধুর লাগুক, প্রিয় লাগুক, ভালো লাগুক। কেন ? কারণ তিনি আমার। বাচ্চার তো মাকে ভালো লাগে। কেন ? কারণ মা তো একান্তভাবে তার আপন। ঠিক এমনিভাবে যদি ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা থাকে, তাহলে তখন সৎসঙ্গ হয়। ভগবান আমার, আমি ভগবানের। কি চমৎকার কথা !

এক সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি বলছিলেন যে তীর্থের অনেক মাহাত্ম্য। গঙ্গা ভালো, যমুনা ভালো, প্রয়াগ খুব ভালো —এরকম তো লোকে বলে, কিন্তু যাবার ভাড়া তো দেয় না। ভাড়া দিলে তবে তো সেখানে যাওয়া যাবে। সৎসঙ্গে খুব ভালো ভালো কথা শোনা যায় এবং পরমাত্মার ধামে যাওয়ার ভাড়াও পাওয়া যায়। সৎসঙ্গে জ্ঞান লাভ হয়, প্রেম লাভ হয়, ভগবানের ভক্তি লাভ হয়। ভগবান শবরীকে বলছেন, '**প্রথম ভগতি সন্তন্‌হ কর সঙ্গা।**' দণ্ডকবন নামক এক অরণ্য ছিল, সেখানে বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত কিছু শুকিয়ে গিয়েছিল। সেখানে শবরী নামক এক ভীল জাতির মহিলা বাস করতেন। সেখানে তাঁর সৎসঙ্গ লাভ হলো, এটা তো ভগবানের কৃপা। মতঙ্গ ঋষি ছিলেন, খুব বৃদ্ধ সন্ত, কৃপার মূর্তি। তিনি শবরীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বৎস, তুমি চিন্তা কোরো না, এখানে বসবাস করো। ঋষি-মুনিরা এর খুব বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু সন্তের কৃপা বড় বিচিত্র ব্যাপার।

ধনী ব্যক্তি প্রসন্ন হলে ধন দান করেন, তাঁরা কিছু জিনিসও দিয়ে দেন, কিন্তু সন্ত কৃপা করলে তো ভগবানকে দিয়ে দেন। তাঁর কাছে ভগবানরূপী সম্পদ আছে। তিনি সামান্য ধনে ধনী নন, প্রকৃত ধনে ধনী, পরিপূর্ণরূপে ধনী এবং সেই ধন এমন অনুপম যে '**দানেন বর্ধতে নিত্যম্**' যত দান করা হয়, ততই বেড়ে যায়। এমন অপূর্ব এ সম্পদ। সুতরাং সন্তব্যক্তি মুক্ত হস্তে

তা খরচ করে থাকেন। অফুরন্ত ভাণ্ডার পড়ে আছে, অপার, অসীম, অনন্ত, যার কোনো শেষ নেই। ভগবানের এমন অনন্ত অপার রত্নভাণ্ডার। তা সত্ত্বেও মানুষ অযথা দুঃখ ভোগ করে যাচ্ছে। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ ! এটা খুবই আশ্চর্যের কথা।

পানীমেঁ মীন পিয়াসী, মোহি দেখত আবৈ হাঁসী।
জল বিচ মীন, মীন বিচ জল হৈ নিশ দিন রহত পিয়াসী॥

ভগবানের মধ্যে সমস্ত সংসার রয়েছে এবং সকলের ভিতর ভগবান আছেন। সেই ভগবানের প্রতি বিমুখ হওয়ায় সন্ত মহাত্মা জীবকে পরমাত্মার সম্মুখ করে দেন— **'সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ।'** আরে ভাই ! পরমাত্মা তো সম্মুখেই আছেন, আমাদের প্রিয় মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু, কুটুম্ব, সম্বন্ধী সর্বভাবে তিনিই আমাদের আপনজন। সেই প্রভু তো আমাদেরই। সন্ত-মহাত্মাদের কাছে এমন কথা শুনে যদি আমরা সেটা দৃঢ়ভাবে মেনে নিতে পারি, তাহলে বিশেষ লাভ হবে। আমরা স্বয়ং এটি ধারণ করি আর কোনো সন্ত-মহাত্মার কথা শুনে তা অন্তর থেকে মেনে নিই—উভয়ের মধ্যে অনেক্য পার্থক্য আছে।

সন্ত-মহাত্মারা যা বলেন, তাঁদের সে সব কথাকে সমাদর করো। কেবল সম্মানিত ব্যক্তির কাছ থেকেই জমানত নেওয়া হয়। অন্য যে কোনো ব্যক্তির জমানত গ্রাহ্য হয় না। ঠিক সেইরকমভাবে ভগবানের দরবারে সন্ত-মহাত্মাদের আর ভক্তদের খুব সম্মান, তাই তো গোস্বামী তুলসীদাস মহারাজ বলেছেন—

সত্য বচন আধীনতা পর তিয় মাতু সমান।
ইতনে পৈ হরি না মিলে তো তুলসীদাস জমান॥

এটা তুলসীদাসজীর জমানত। সন্তগণ জমানত দিয়ে দেন এবং তা ভগবানের দরবারে গ্রাহ্য হয়। সন্তদের কাছে পরমাত্মার বিশাল রত্নভাণ্ডার গচ্ছিত থাকে। তার থেকে বিনামূল্যে ধন পাওয়া যায়। বিনামূল্যে উপার্জিত, সঞ্চিত ধন পাওয়া যায়। সৎসঙ্গের মাধ্যমে এইসব লাভ করা যায়।

প্রশ্ন— কিছু লোকের তো সৎসঙ্গের প্রতি কোনো রুচি হয় না। এর কারণ কী ?

উত্তর—পাপী ব্যক্তির এমনই স্বভাব যে তার সৎসঙ্গ ভালো লাগে না।

পাপবন্ত কর সহজ সুভাউ। ভজনু মোর তেহি ভাব ন কাউ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪৩।২)

তুলসী পূরব পাপ তে, হরি চর্চা ন সুহায়।
জৈসে জ্বর কে জোর তে, ভূখ বিদা হ্বৈ জায়॥

মানুষের জ্বর হলে খিদে পায় না, অন্ন রুচিকর লাগে না। অন্ন রুচিকর লাগে না মানেই তার রোগ হয়েছে। যখন পিত্তের প্রকোপ হয় তখন মিশ্রীও তিক্ত লাগে। মিশ্রী তিক্ত নয়, তার জিভই তিক্ত হয়ে যায়। এই প্রকারে কোনো ব্যক্তির ভগবানের চর্চা ভালো না লাগার কারণ হল যে নিশ্চয় সেই ব্যক্তির কোনো বড় ধরনের রোগ হয়েছে। ভগবদ্ কথার প্রতি রুচি না হলে তো এটা স্পষ্ট যে তার অন্তঃকরণ খুব ময়লা, সামান্য ময়লা নয়, অত্যধিক মাত্রায় ময়লা।

প্রশ্ন—অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি আদি) অত্যধিক ময়লা হয়ে গেলে কি তা সৎসঙ্গে দ্বারা দূর হতে পারে ?

উত্তর— সৎসঙ্গ সমস্ত ময়লা দূর করতে পারে ; কিন্তু মানুষ তো সৎসঙ্গের কাছে-পিঠে আসে না। খুব জ্বর হলে অন্ন ভালো লাগে না এবং মিশ্রী তেতো লাগে। কী করা যাবে ? মিশ্রী তেতো লাগা সত্ত্বেও খেয়ে যেতে হবে। মিশ্রীর এমনই গুণ যে তা পিত্তকে শান্ত করে দেয় এবং ক্রমশঃ তা মিষ্টি লাগে। ঠিক এমনিভাবে ভজনে রুচি না হলেও ভজন করতে থাকো। ভজন করতে করতে যে যে পরিমাণে পাপ নষ্ট হবে, সেই সেই পরিমানে ভজন মধুর লাগবে। সৎসঙ্গে এমন অনেক লোক আসে যাদের আগে সৎসঙ্গে কোনো রুচি ছিল না। কিন্তু কারো কথায় একবার সৎসঙ্গে আসার পর তারা এখন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে আসতে শুরু করেছে।

প্রশ্ন—সৎসঙ্গ প্রতিদিন কেন করা উচিত ?

উত্তর— সৎসঙ্গের মহিমা আর কী বলব ? সৎসঙ্গ তো রোজ করা

উচিত, প্রতিদিন করা উচিত। এটা ত্যাগ করা কখনো উচিত নয়। সৎসঙ্গের দ্বারা সাংসারিক বাধা দূর হয়ে যায়। ব্যাধি, ক্রোধ, মোহ, ঈর্ষা নানা বাধাগ্রস্ত হওয়া এই ধরনের নানা প্রকারের সর্প আছে যারা প্রতিনিয়ত ছোবল মারতে থাকে। এদের বিষে লোকে ভয় পেয়ে যায়। অতএব লোকে যদি সৎসঙ্গে গিয়ে সৎসঙ্গরূপী বটিকা সেবন করেন, তাহলে তারা সুস্থ হয়, প্রসন্ন হয়। মনের চিন্তা দূর হয়। তারপর ফিরে গিয়ে সংসারের কাজ করে। কাজ করতে করতে তার মধ্যে মেতে গেলে আবার বিষ উঠে যায়। সেই বিষ সৎসঙ্গে গেলে ঠিক হয়ে যায়। এইরকম করতে পারলে আমাদের যে সব শত্রু আছে কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি, তারা সব মরে যায়। যেমন অন্ন-জল আবশ্যক, নিশ্বাস নেওয়া আবশ্যক, তেমনি সৎসঙ্গও প্রতিদিন করা জরুরী। সৎসঙ্গ প্রতিদিনের খোরাক। সৎসঙ্গের মাধ্যমে প্রভূত শান্তি লাভ হয়। অনেক মানসিক রোগ দূর হয়। সৎসঙ্গ সূর্যের মতন যা অন্তঃকরণের অন্ধকার দূর করে। পাপ দূর হয়, বিনা প্রশ্নে শংকা সমাধান হয়। মনের নানা রকমের অস্থিরতা শান্ত হয়। যেখানেই সৎসঙ্গ লাভ হোক না কেন তাকে বিশেষভাবে ভগবানের কৃপা মনে করা উচিত। ভগবান শংকর কেবল দুটি জিনিস প্রার্থনা করছেন—**'পদ সরোজ অনপায়নী ভগতি'** এবং **'সদা সৎসঙ্গ'**।

প্রশ্ন—সৎসঙ্গের মাধ্যমে কেমন করে অনায়াসে লাভ হয় ?

উত্তর—সৎসঙ্গের মাধ্যমে যে ধরনের লাভ হয় তা সাধনার দ্বারা হয় না। সাধনার মাধ্যমে যে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করে, সে উপার্জন করে ধনী হয় আর সৎসঙ্গের দ্বারা দত্তক পুত্র রূপে উপার্জিত ধন হস্তগত হয়। সাধু-মহাত্মাদের উপার্জন করা ধন তার লাভ হয়। ধনীর দত্তক পুত্র হলে অর্থের জন্য কি পরিশ্রম করতে হয় ? আজ কাঙ্গাল, কাল লাখপতি। সে তো দত্তক পুত্র! অপরের উপার্জিত ধনের মালিক হয়ে যায়। সৎসঙ্গের দ্বারা এমন বস্তু লাভ হয়, যা বহু বছর সাধনা করার পরেও হস্তগত হয় না। অতএব সৎসঙ্গের সুযোগ পেলে অবশ্যই করা উচিত। এতে অনায়াসে কল্যাণ হয়।

প্রশ্ন—নাম জপের চেয়েও সৎসঙ্গের অধিক মহিমা জানালেন—এর কারণ কী ?

উত্তর—যে সৎসঙ্গ করে সে নাম জপ না করে থাকতে পারে না। তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই নাম-জপ হয়।

প্রশ্ন—সৎসঙ্গ লাভ না হলে কী করা উচিত ?

উত্তর—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত। হে নাথ ! হে নাথ ! বলে তাঁকে ডাকা উচিত। ভগবান সর্বশক্তিমান। তাঁকে ডাকলে তিনি প্রকৃত সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করে দেবেন। এছাড়া সৎ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা উচিত।

প্রশ্ন— মানুষকে শোধরানোর সবথেকে শ্রেষ্ঠ উপায় কী ? আপনি নিজের অনুভবের কথা বলুন।

উত্তর— আমার যতটা লাভ সৎসঙ্গের দ্বারা হয়েছে, ততটা কোনো সাধনার দ্বারা হয়নি। সৎসঙ্গের মধ্যে থাকলে খুব বড় লাভ হয়, যার কোনো সীমা নেই। সৎসঙ্গ কখনো ছেড়ো না। যে সৎসঙ্গের দ্বারা নিজের হৃদয়ের গ্রন্থি খুলে যায়, আত্মসাক্ষাৎকার হয়, আলোকপ্রাপ্ত হয়—এমন সৎসঙ্গ ছেড়ো না। সব কিছু পাওয়া যায় কিন্তু **'সন্ত সমাগম দুর্লভ ভাঈ'** অর্থাৎ যথার্থ সাধুসঙ্গ খুবই দুর্লভ।

প্রশ্ন—সৎসঙ্গের দ্বারা কেমন করে প্রকাশ (মার্গদর্শন) হয় ?

উত্তর— সৎ সঙ্গ লাভের অর্থ হল প্রকাশ (আলোক) লাভ। যেমন আমরা রাত্রে কোথাও গেলে মোটরগাড়ির আলো সামনের দিকেই থাকে। এমন হয় না যে আলো পিছনে পড়ে যাবে আর মোটর সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আলো সর্বদা সামনের দিকেই থাকে এবং সেই আলো চলার জন্য রাস্তা নির্দেশ করে দেয়। ঠিক এইভাবে সৎসঙ্গের দ্বারাও মানুষ আলোকপ্রাপ্ত হয় এবং নির্দেশ লাভ করে যে সে কেমন করে চলবে। যেমন, কেবল আলোর তেজ বাড়ালে কিন্তু না চললে রাস্তার নির্দেশ পাওয়া যায় না, তেমনি সৎসঙ্গের কথা কেবল স্মরণ করলে, গ্রন্থে পড়লে, লোককে শোনালেও যদি সেই অনুসারে প্রাত্যহিক জীবনে আচরণ না করা হয় তবে প্রকৃত লাভ হয় না। অথচ অল্প আলোতেও যদি যতদূর পর্যন্ত রাস্তা

দেখা যায় ততদূর যাওয়া যায়, তাহলে সামনের রাস্তা ঠিকই দেখা যাবে—এই হল নিয়ম। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে শুধু আলোর তেজ ইচ্ছামতন বাড়ালেও গন্তব্য স্থান দেখা যাবে না। এইরকম-ভাবে সৎসঙ্গের দ্বারা যতটা আলোক অর্থাৎ দিশা পাওয়া গেছে সেই অনুসারে নিজের জীবন-গঠন করা উচিত, তা পালন করা উচিত। তাহলেই সৎসঙ্গ থেকে আলোকপ্রাপ্ত হওয়া সার্থক হবে। যদি জীবন গঠন না করা যায়, তাহলেও এই সৎসঙ্গের আলো কখনো নিরর্থক হয় না ; কারণ সত্যবস্তু সর্বদা প্রকট হয়েই থাকে। সত্যের বিজয় হয়, মিথ্যার বিজয় কখনো হয় না। যদি সত্যের প্রতি নিষ্ঠা রাখা যায় তাহলে খুব শীঘ্র অনেক কিছু লাভ করা যায়। সুতরাং সৎসঙ্গের কথা নিজের আচরণে অনুসরণ করা উচিত।

———o———

দুর্গুণাদির ত্যাগ

মানুষ দোষ করে ফেলে যখন সে কারো কাছে কিছু চায়। এই কথাটার প্রতি আপনারা বিশেষ মনোযোগ দিন। মানুষ 'অহং'-কে ধরে রাখে ও সুখ চায় এবং সংযোগজনিত সুখের অভিলাষ তার অন্তরে জাগ্রত হয়। অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, মানুষ পাপ করতে চায় না, তবুও সে পাপ কেন করে ফেলে ? ভগবান এই উত্তর দিয়েছিলেন যে তার মনে সুখ-ভোগ করার এবং সংগ্রহ্ করার কামনা আছে, চাহিদা আছে। যতক্ষণ এই চাহিদা থাকবে, ততক্ষণ পাপ হতে থাকবে। সাবধান থাকা সত্ত্বেও আবার গাফিলতি হয়ে যাবে।

এটা দূর করার উপায় কী ? প্রকৃত উপায় হল অন্তর থেকে প্রায়শ্চিত্ত করা, আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া, অন্তরে অনুতাপের জ্বালা অনুভব করা। যে পাপ কর্মের দ্বারা যতটা সুখ লাভ হয়েছে, সেই সুখের চেয়ে যদি অনুতাপ অধিক হয় এবং এই প্রতিজ্ঞা করা হয় যে কখনো কাউকে ধোঁকা দেব না, এমন ভুল কখনো করব না—এমন দৃঢ় নিশ্চয় করা হয় এবং তাতে অবিচল থাকা যায় তাহলে পূর্বকৃত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি নিশ্চয় করা হয় এবং সেই সঙ্গে আগের মত পাপও করা হয়, তাহলে তা কখনো নষ্ট হয় না। তখন নতুন-নতুন পাপ সৃষ্ট হয় এবং তার ফলে পতন হতেই থাকে। যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া যায় যে এখন থেকে এমন কাজ করব না এবং এটা যদি দৃঢ়ভাবে মানা হয়, তাহলে তার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যাবে, নির্মল হয়ে যাবে। যতটা অধিক অনুতাপ হবে এবং যতটা নিজের নিশ্চয় দৃঢ় হবে, ততটা তাড়াতাড়ি অন্তকরণ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এই দুটি কথা খুবই মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর দ্বারা অন্তঃকরণ নির্মল হয়ে যায় এবং পাপ নাশ হয়ে যায়।

একটি কথা খেয়াল করা উচিত যে মানুষ স্বয়ং পরমাত্মার অংশ

সুতরাং স্বয়ং দোষী নয়। সংযোগজনিত সুখ নেওয়ার জন্যই সে দোষী হয়ে যায়। নিজের অভিমান (অহংভাব) এবং কামনা — এই দুটি হল মহা পতনের কারণ এবং এর দ্বারা কিছুই লাভ হয় না এই কথাটি বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা উচিত। আমার মনে হয় যে এই কথাটার প্রতি লোকেরা তেমন মনোযোগ দেয় না। সংসার থেকে সুখের প্রত্যাশা করা এবং এই ধরনের লোভ করা যে এর দ্বারা আমি লাভান্বিত হব, এতটা আমি নিয়ে নেব, এতটা রেখে দেব, এতটা ঠকিয়ে নেব যার ফলে আমার সুখ হবে– এই ধরনের মনোভাব যদি থাকে, তাহলে এর চেয়ে অনিষ্টকর দুর্গুণ আর কিছু হতে পারে না এবং সে প্রবলভাবে বঞ্চিত হয়। সজ্জন শ্রোতৃবৃন্দ ! আপনাদের মনঃপূত হোক বা না হোক, কিন্তু আমি যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে স্থির নিশ্চিত হয়েছি যে এতে বিন্দুমাত্র লাভ নেই বরং লোকসান অনেক বেশি। অথচ এমনই অবস্থা যে মানুষ তাতে লাভই দেখে, কোনোরকম লোকসান দেখতে পায় না।

করহিঁ মোহ বস নর অঘ নানা। স্বারথ রত পরলোক নসানা॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪০।২)

মানুষ স্বার্থপর হয়ে নানা প্রকারের পাপ করে থাকে। তার অন্তঃকরণ মূঢ়তায় আচ্ছন্ন হওয়ায় সে মোহবশত মনে করে যে আমি ঠিক কাজ করছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই নিজের হত্যা, নিজের পতন এবং নিজের লোকসান করে থাকে।

সজ্জন শ্রোতৃবৃন্দ ! কৃপা করে আজ থেকে অন্যায় করা ছেড়ে দিন, পাপ করা থেকে বিরত হোন। যদি শান্তি এবং সুখ চান তাহলে অন্যের অধিকার হরণ করার ইচ্ছা কখনো রাখবেন না, নতুবা কেউ রক্ষা করতে পারবে না; নানা কষ্ট ভোগ করতেই হবে ; কারণ যখন আপনি একবার পাপকে ধরেছেন, তখন পাপের বাপকেও সেই সঙ্গে ধরেছেন।

একটি গল্প আছে। একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ভগবৎকথা ব্যাখ্যা করতেন, লোককে শোনাতেন, পড়াতেন। একদিন পণ্ডিতজীর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন যে মহারাজ ! পাপের বাপ কে ? এর উত্তর পণ্ডিতজী

দিতে পারলেন না। তাঁর খুব দুঃখ হল যে আমি এত লেখাপড়া শেখা পণ্ডিত আর এ তো কিছুই জানে না, তা সত্ত্বেও আমি তো এর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। তিনি অনুতপ্ত হয়ে উঠে চলে গেলেন এবং স্ত্রীকে বলে গেলেন যে তোমার প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত তোমার হাতের রান্না খাব না। স্ত্রী অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন কিন্তু পণ্ডিতজী শুনলেন না। স্ত্রীর দুঃখ হল, কিন্তু তিনি ভেবে দেখলেন যে সংশোধন হয়ে গেলে তো ভালোই হবে, সেই জন্য নীরব রইলেন।

পণ্ডিতজী যেতে লাগলেন। পথের মাঝে একটি বেশ্যার ঘর ছিল। সে পণ্ডিতজীকে চিনত। বেশ্যাটি খুব আশ্চর্য হল দেখে যে আজ পণ্ডিতজী কেমন উদাস হয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। সে সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল — মহারাজ ! আজকে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, কী ব্যাপার ? তখন পণ্ডিতজী বললেন যে আমার খুব দুঃখ হয়েছে। 'কোন ব্যাপারে ?' বেশ্যা জিজ্ঞেস করল। পণ্ডিতজী উত্তর দিলেন — আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন কিন্তু আমি উত্তর দিতে পারলাম না। সেইজন্য কাশী যাচ্ছি। সেখানে অধ্যয়ন করব। পণ্ডিত ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করব। তারপর ঘরে ফিরব। বেশ্যা জিজ্ঞেস করল যে প্রশ্নটা কী ? পণ্ডিতজী উত্তর দিলেন যে আমার স্ত্রী প্রশ্ন করেছিল যে পাপের বাপ কে ? আমি উত্তর দিতে পারলাম না। সে বলল– এর উত্তর তো আমি দিয়ে দেব। আপনি সেখানে কেন যাচ্ছেন ? এটা তো খুব সোজা প্রশ্ন, আমি এর উত্তর বলে দেব। পণ্ডিতজী বললেন—খুব ভালো কথা, আমাকে তো উত্তরটা জানতে হবে। এই বলে পণ্ডিতজী থেকে গেলেন।

অমাবস্যার প্রথম দিন পণ্ডিতজীকে একশো টাকা উপহার দিয়ে বেশ্যা বলল— আমার প্রার্থনা এই যে আপনি আমার ঘরে ভোজন করুন, ইচ্ছা করলে আপনি স্বয়ং রান্না করে নিন। পণ্ডিতজী বিচার করে দেখলেন যে এতে দোষ কোথায় ? অতএব নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নিলেন। দ্বিতীয় দিন পণ্ডিতজী সেখানে চলে গেলেন। বেশ্যা ভোজনের সমস্ত সামগ্রী প্রস্তু করে দিল। সমস্ত কিছু জড়ো করে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে সে সামগ্রী সামনে

এনে রেখে দিল এবং আরো একশো টাকা পণ্ডিতজীর সামনে রেখে বেশ্যা বলল—মহারাজ ! আপনি তো অন্যের হাতে তৈরি রান্না খেয়েই থাকেন, আমিও ভালো করে আপনার জন্য রান্না করে দিচ্ছি। এইটুকু আমার প্রতি কৃপা করুন। পণ্ডিতজী চিন্তা করে দেখলেন যে তার তৈরি রান্না খাওয়ার মধ্যে দোষ কোথায় ? তিনি তো অন্যের হাতের তৈরি রান্না খেয়েই থাকেন, না হয় আজ এর হাতের তৈরি রান্না খেলেন। বেশ্যা, ক্ষীর, মালপোয়া, পুরী, শাক ইত্যাদি সব খুব ভালো করে রান্না করল।

রান্না প্রস্তুত হওয়ার পর সে বলল—পণ্ডিতজী মহারাজ ! আপনি এখন খেতে শুরু করুন। তাঁর সামনে সমস্ত রান্না সে সাজিয়ে দিল। পণ্ডিতজীর সামনে একশো টাকা রেখে সে বলল যে আরেকটু কৃপা করুন, আমার হাত থেকে খাবারের গ্রাস গ্রহণ করুন। পণ্ডিতজী ভেবে দেখলেন যে এই প্রস্তাবের মধ্যে দোষ কী থাকতে পারে ? এর হাতের তৈরি রান্না নিজের হাতে গ্রহণ না করে যদি সরাসরি তার হাত থেকেই গ্রহণ করা হয় তাহলে তার মধ্যে তফাৎ কোথায় ? অতএব পণ্ডিতজী প্রস্তাব স্বীকার করে নিলেন। বেশ্যা খাবারের গ্রাস তৈরি করে পণ্ডিতজীর মুখে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। যেমনি পণ্ডিতজী মুখ খুললেন, অমনি সে পণ্ডিতজীর গালে জোর থাপ্পড় মেরে বলল যে এতক্ষণও আপনার হুঁশ হল না, খবরদার যদি আমার হাত থেকে একটিও দানা খান। আমি আপনাকে ধর্মভ্রষ্ট করতে চাই না। আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে পাপের বাপ কে ? শাস্ত্রে বেশ্যার অন্ন কতটা নিষিদ্ধ তা বলা হয়েছে। আপনি পড়েছেন ? 'হ্যা আমি পড়েছি'—পণ্ডিতজী বললেন। তাহলে আপনি কি করে তা খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন ? এবং তাও আমার রান্না করা এবং আমারই হাত থেকে, এর কারণ কী ? আপনি বুঝতে পারেননি। এই যে লোভ, এটাই হল পাপের বাপ।

গীতা (২।৪৪) তে দু-প্রকারের আসক্তির কথা বলা হয়েছে —'**ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্**' সুখভোগ এবং সংগ্রহ। এই দুটির মধ্যে যে কোনো একটি থাকলেও মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। যদি দুটি থাকে, তাহলে তো

তার পরিণতি সম্বন্ধে আর বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রশ্ন করা হয়েছে যে মানুষ এমন কেন করে থাকে ? সে লোভে বশীভূত হয়ে করে থাকে। সুখ-আরাম হোক এবং ধনের প্রাপ্তি হোক—এমন কামনা জাগ্রত হলে তবেই মানুষ নানাপ্রকারের পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন ওষুধের নামে যা কিছু একটা হোক খাইয়ে দেওয়া হয় এবং ব্যবসার নামে যা ইচ্ছে তাই করা হয়। শুনেছি, সনাতন ধর্মের লোকেরা নাকি মিলিটারির জন্য মাংস সাপ্লাই পর্যন্ত করেছে। এই তো এখনকার ব্যবসার অবস্থা ! যদি ভেতরে লোভ থাকে যে অর্থলাভ হোক তাহলে তার জন্য মানুষ কত রকমের অনর্থ করে থাকে ! ভেবে দেখলে কত ভয়ংকর ধরনের অন্যায় কাজ-কর্ম করা হয় আর হাতে কি এল ? এই ধন কতদিন থাকবে ? আপনি কতদিন জীবিত থাকবেন ? কিন্তু পাপের পুঁটলি তো বেঁধে ফেলা হয়েছে। এইজন্য সন্ত-ব্যক্তিরা বলে থাকেন যে তুই একটু ভেবে দেখ, তোর এতটুকুও ভয় হয় না। **'পাপ কর্মসে ডর রে মেরা মনবা রে।'**

রে মন ! তুই পাপ-কর্মকে ভয় কর। বৃথাই অনর্থ করে থাকিস, লোকের ধন লুণ্ঠন করিস এবং নিষিদ্ধ সুখ ভোগে লিপ্ত থাকিস। নিষিদ্ধ রীতিতে সুখ ভোগ করে থাকিস। একটু ভেবে দেখ, মনুষ্য-শরীর লাভ হয়েছে। ভালো-ভালো কথা শোনার বলার সুযোগ পাওয়া গেছে, তবুও তুই এমন কাজ করে থাকিস। সজ্জন শ্রোতৃবৃন্দ ! জগতের উদ্ধার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এমন ব্যক্তির উদ্ধার কখনো হবে না যে মহা অপরাধ করে। এমন ব্যক্তিই আবার প্রশ্ন করে যে বৈরাগ্য কেন স্থায়ী হয় না ? বৈরাগ্য কী করে স্থায়ী হবে ? যখন বাহ্যিকভাবে অত্যধিক ভোগ সামগ্রী দ্বারা সুখ ভোগ করা হয় এবং ভোগ ইচ্ছা ভিতরে বিরাজ করছে, তখন বৈরাগ্য কেমন করে টিকবে ? সেখানে বৈরাগ্য কিছুতেই টিকবে না। কারণ এটা হল বিরুদ্ধ অবস্থা। কামনার দ্বারা বশীভূত হয়ে নিষিদ্ধ আচরণ করা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। ভাই ! যদি আপনি দুর্গতি থেকে বাঁচতে চান, নরকের থেকে বাঁচতে চান, চুরাশী লক্ষ যোনি থেকে বাঁচতে চান, নিদারুণ কষ্ট থেকে বাঁচতে চান, তাহলে আজ থেকে, এই মুহূর্তে নিশ্চয় করে নিন

অন্যের স্বত্ব নেবেন না। যদি কোনো না কোনো ভাবে নিয়ে থাকেন, তাহলে সুদে-আসলে তাকে পুরোপুরি ফিরিয়ে দিন। অন্যের স্বত্ব হরণ করার মনোভাব অন্তর থেকে একেবারে নির্মূল করে দিন। সজ্জনবৃন্দ ! জীবনকে নির্মল করুন ! তবেই তো এইসব পরমার্থিক কথা অনুধাবন করতে পারবেন। নিজের আচরণের মাধ্যমে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু অন্তরের সদিচ্ছা না হলে এইসব কথা অনুধাবন করতে পারবেন না। নিজে স্মরণ করুন, অন্যকে শোনান, কিন্তু যতক্ষণ অন্তরে পাপ বিরাজ করবে, ততক্ষণ কিছুই হবে না। এইজন্য আপনারা অন্তত পক্ষে সর্বপ্রথম এই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ভাবে করে নিন যে অন্যায়পূর্বক ভোগ এবং অন্যায়পূর্বক সংগ্রহ কখনো করবেন না। সর্বপ্রথম ত্যাগ হল নিষিদ্ধ কর্মের ত্যাগ।

'ত্যাগ দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি' শিরোনামে পূজ্য শ্রীজয়দলাল গোয়েন্দকা মহাশয়ের (গীতাপ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা) একটি লেখা আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে সর্বপ্রথম ত্যাগ হল নিষিদ্ধ কর্মের ত্যাগ—মিথ্যা, কপট, জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা, অভক্ষ্য-ভক্ষণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ আচরণ শরীর, বাণী এবং মনের দ্বারা কখনো না করা। এই সমস্ত হল পরমার্থিক মার্গের কলঙ্ক। সুতরাং প্রথমেই আপনারা কি এই সমস্ত কলঙ্ক ত্যাগ করতে পারবেন না ? অন্তর থেকে ত্যাগ করুন। অন্তর থেকে ত্যাগ করার মনোভাব মুখ্য হলে যদি কখনো কোনো কারণবশতঃ কোনে পাপ বা দোষ হয়ে যায়, তখন অন্তরে তীব্র অনুতাপের জ্বালা সৃষ্টি হবে—এই হল প্রকৃতভাবে ত্যাগের ইচ্ছা থাকার পরিচয়। এর ফলে অন্তরে অশান্তির সৃষ্টি হবে। সেই অনুতাপের জ্বালার মধ্যে এমন শক্তি আছে যে দ্বিতীয়বার পাপ হবে না। দৃঢ়তাপূর্বক বিচার করে নিন যে এখন থেকে পাপ করবেন না। হে নাথ ! এমন বল দিন, এমন শক্তি দিন যাতে আপনার আজ্ঞার বিরুদ্ধ কোনো কাজ না করি। তাহলে ভগবান সাহায্য করেন, ধর্ম সাহায্য করে, শাস্ত্র সাহায্য করে, সন্ত-মহাত্মা সাহায্য করেন। যে ব্যক্তি প্রকৃত আন্তরিকতার সঙ্গে পরমাত্মার পথের যাত্রী হয়, তাকে সমস্ত বিশ্ব সংসার কৃপা করে এবং সাহায্য করে

থাকে। সকলেই তাকে সাহায্য করে এবং তার সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকে।

একজন সন্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, তিনি অন্ধ ছিলেন। সেই সাধু শুনিয়েছিলেন যে 'আমার বৈরাগ্য হওয়ার পর আমি বাইরে জঙ্গলে বাস করতাম। শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য একজন ভক্ত একটি মূল্যবান কম্বল দিয়েছিল। সেই একটিমাত্র কম্বল ছাড়া আমার কাছে ভালো কোনো বস্তুই ছিল না। একান্তে রাত্রিবাস করার সময় নিকটে কিছু লোকের উপস্থিতি টের পেলাম, তাদের কথার শব্দ শুনতে পেলাম। মনে ভাবলাম যে কি জানি এরা ডাকাত না চোর, না অন্য কেউ ? আমার কাছে তো শুধু এই কম্বল আছে যেটা দেখতে পেলে এরা নিয়ে যাবে। অতএব না হয় আমি এদের সঙ্গে আগে কথা বলি। সুতরাং ওদের বললাম যে, ভাই ! বলো তো তোমরা কে, কী চাও ?' তারা এসে দেখল যে এ তো একজন বাবাজী। তারা এরকম দেখে বলল যে 'মহারাজ ! আপনি তো সাধু, সেইজন্য আমরা আপনাকে সত্যি কথা বলছি। আমরা চুরি করতে এসেছিলাম। আমরা পেশায় চোর নই, আমরা তো গৃহস্থ। রোজগার করে খাই, কিন্তু রাজ্যের খাজনা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় আমরা দিতে পারছি না, সেইজন্য বাধ্য হয়ে আমরা চুরি করতে বেরিয়েছি।' সাধু বললেন যে 'ভাই, চুরি করা ভালো নয়।' তারা বলল যে 'আমরাও সেটা বুঝি ; কিন্তু কী করব ? এত খাজনা কোথা থেকে দেব ? আমাদের কাছে তো নেই।' তারা তাঁকে এই কথা বলল, কিন্তু বাবাজীর কম্বল নিল না। মানুষ লোভে পড়ে কী না করে, লোভে পড়ে চুরি করে, অপরকে দুঃখ দেয়, ধন কেড়ে নেয়। এটা কত বড় অন্যায়, কত বড় পাপ। নির্ধন হওয়া সত্ত্বেও, অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও পাপ না করা—এটা কত বড় ব্যাপার। দুঃখ সহ্য করা, তবুও কখনো পাপ না করা, অন্যায় না করা।

সিবি দধীচ হরিচন্দ নরেসা। সহে ধরম হিত কোটি কলেসা॥

(শ্রীরামচরিতমানস ২।৯৪।২)

ধর্মের জন্য এঁরা কোটি কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু কখনো ধর্ম

থেকে বিচলিত হননি।

ধীরজ ধর্ম মিত্র অরু নারী। আপদ কাল পরিখিঅহিঁ চারী॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৩।৪।৪)

এইসবের পরীক্ষা আপদ-বিপদের সময় হয়ে থাকে। এটা মানুষের পক্ষে খুবই আবশ্যক যে সে যেন ধৈর্য না হারায়। কখনো কখনো যখন খুব ঝড় হয়, তখন বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ে। কিন্তু সেই ঝড়ে ও যারা টিকে থাকে, তারা আনন্দে থাকে, আর কোনো ভয় থাকে না। এইরকম ভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির ঝড়ের প্রকোপ মিটে যাওয়ার পর সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। একটু ধৈর্য ধরুন। যে রকমই বিপদ-আপদ আসুক পাপ করব না, অন্যায় করব না, শাস্ত্র নিষিদ্ধ আচরণ করব না, খেতে না পেয়ে যদি মরে যাই তো মরে যাব। এছাড়া আর কি হবে, বলুন ? নিজের কাছে কিছু না থাকলে তো না খেয়ে মরে যাব, এছাড়া অন্য কোনো দণ্ড হবে না। যদি পাপ করা হয়, তাহলে নরকে যেতে হবে এবং চুরাশী লক্ষ যোনিতে যাতায়াত করতে হবে—এই কথাটা যদি কেউ দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে নেয়, তাহলে কোনো শক্তিই তাকে দিয়ে কখনো পাপ করাতে পারবে না।

শাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ—এই তিনজনের অস্ত্রের বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মার কাছে ব্রহ্মাস্ত্র, ভগবান বিষ্ণুর নারায়ণাস্ত্র এবং মহাদেবের পাশুপতাস্ত্র আছে। এই সব মন্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা চালিত হয়। যার প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করা হয়, সে শেষ হয়ে যায়। ব্রহ্মাস্ত্রকে নিবারণ করার উপায় হল তার উপসংহার করে নেওয়া। মন্ত্রের দ্বারা তাকে উল্টে নিলে সেটা তখন সম্মুখে ধাবিত হতে পারে না। নারায়ণ-অস্ত্র প্রয়োগ করলে তা শেষ করে দেয়। তার নিবারণের উপায় হল তাঁর শরণাগত হওয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা। শরণাগত হয়ে গেলে সেই নারায়ণ-অস্ত্র কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু পাশুপতাস্ত্র প্রয়োগ করলে যা কিছু করা হোক না কেন, সবই বৃথা। সে তো সংহার করবেই। খুব কম লোকের কাছে পাশুপতাস্ত্র আছে। যখন মহাভারতের যুদ্ধ হল, তখন ভগবান শংকরের প্রদত্ত পাশুপতাস্ত্র অর্জুনের কাছে ছিল। ভগবান শংকর বলেছিলেন যে তোমাকে এর প্রয়োগ

করার প্রয়োজন হবে না। এটা তোমার কাছে রাখলেই তুমি (প্রয়োগ না করেই) বিজয়ী হবে, প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই, প্রয়োগ করলে সংসারে প্রলয় হয়ে যাবে। এইজন্য প্রয়োগ কোরো না।

সজ্জনবৃন্দ ! ঠিক এইরকমভাবে আপনাদের পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য যে পাশুপতাস্ত্র আছে, সেটা আপনাদের জানাচ্ছি। আপনারা কৃপা করে শুনুন এবং সেটা অনুধাবন করুন, তাহলে আমি কৃতার্থ হব। সেটা হল এই যে মরে যাব তবুও পাপ করব না, অন্যায় করব না ! করব না ! করব না ! এইরকম আপনাদের কেবল দৃঢ় বিচার হয়ে যাক। এইরকম হলে যে আপনারা বিনা অন্নে মারা যাবেন, কথাটা তা নয়। বিনা অন্নে যদি মরতে হয় তবুও পরোয়া নেই, কিন্তু পাপ-অন্যায় করব না। এটা হল অস্ত্র প্রয়োগ করা। এই প্রয়োগ কিন্তু করতে হবে না। কারণ দৃঢ় বিচার হয়ে গেলেই আপনি বিনা অস্ত্র প্রয়োগ করেই বিজয়ী হবেন। আমি মৃত্যু স্বীকার করি, বিপদ-আপদ স্বীকার করি, কিন্তু পাপ স্বীকার করি না, এইরকম দৃঢ় প্রত্যয় হলে কেউ আপনাকে দিয়ে পাপ করাতে পারবে না, অন্যায় করাতে পারবে না। কারো শক্তি নেই যে অন্যায় করিয়ে নেবে। সঙ্গে রাখুন ভগবানের উপর ভরসা। স্মরণ করতে থাকুন যে, নাথ ! এই সিদ্ধান্ত তো আমারই, কিন্তু বল আপনারই। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে আপনার বল প্রয়োজন, তাহলেই কাজ সিদ্ধ হবে। অর্জুনকে ভগবান বললেন যে তুমি নিমিত্তমাত্র হও।

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্। (গীতা ১১।৩৩)

আমি তো নিমিত্তমাত্র, কিন্তু এটা প্রকৃতভাবে সিদ্ধ হওয়া তো আমার সাধ্যের বাইরে। হে নাথ ! আপনি সিদ্ধ করুন। **'উস সেবক কী লাজ, প্রতিজ্ঞা রাখে সাঁঈ'**, **'আছী করে সৌ রামজী'**। রামজী যা করেন ভালোই করেন। ভগবানের দ্বারা কেবল আমাদের মঙ্গলই হয়, রক্ষা হয়, সহায়তা হয়, লাভ হয়, লোকসান কখনো হয় না।

'ভূণ্ডী বনৈ সৌ আপকী'—ভূণ্ডী (খারাপ) তো আমাদেরই, নিজেদেরই, খারাপ কাজ তো আমরা নিজেরাই করে থাকি। যদি আমরা

নিজেরাই প্রস্তুত না হই, তাহলে কেউ আমাদের দিয়ে খারাপ কাজ করাতে পারবে না। আইনের জন্য এমন করতে হয়েছে, অন্যদের জন্য এমন হয়েছে, কুসঙ্গ দোষের জন্য এমন হয়েছে, পরিবেশটাই এমন হয়ে গেছে, আমাদের ভাগ্যই এমন ছিল, ভালো সঙ্গ লাভ হয়নি, গুরু লাভ হয়নি ইত্যাদি অজুহাত সব ভাঁওতাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। কেউই কিঞ্চিৎমাত্রও আপনাকে দূষিত করতে পারবে না, যতক্ষণ আপনি নিজে দূষিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত না হন এবং এই ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প রাখেন এবং ভগবানের আশ্রয় ধরে থাকেন। অন্তর থেকে প্রভুকে ডাকতে থাকুন যে, হে নাথ ! আপনার কৃপা না হলে এইসব আমার দ্বারা হবে না। এইভাবে কৃপার ওপর ভরসা রাখলে তার পতন কখনো হতে পারে না।

ভগবানের চরণের আশ্রয় গ্রহণ করায় ভগবান বলেন—

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। (গীতা ১৮।৬৬)

সমস্ত পাপ থেকে আমি মুক্ত করে দেব। তুমি চিন্তা কোরো না। **'মামেকং শরণং ব্রজ'** — এই হল শর্ত। যদি ধনের শরণ নাও ; মিথ্যা, কপটতা, প্রবঞ্চনার আশ্রয় নাও, তাহলে ভাই, আমি কিছু করতে পারব না। মানুষ কি করে ? মিথ্যা, কপটতা, প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

যদি আজ বলা হয় যে পাপ কোরো না, তাহলে লোকে বলবে যে মহারাজ ! আজকের যুগে এটা চলতে পারে না। আপনার এই কথাটা সেকেলে, বিগত যুগের। এই যুগে এমন চলতে পারে না। এইরকম করলে তো অভুক্ত থেকে মরে যাব। সুতরাং এটা মানতে পারব না। আজকের যুগে সততার সঙ্গে কেমন করে জীবন নির্বাহ করব ? লাখ টাকা রোজগার করলে তো প্রায় অর্ধেক ট্যাক্সের খাতে দিয়ে দিতে হয়। আমাকে একজন জিজ্ঞেস করলেন যে এখন বলুন এই পরিস্থিতিতে কিভাবে রোজগার করব, কী খাব ? এই যুগে মানুষ সততার সঙ্গে কাজ করতে পারে না। আমার বক্তব্য হল যে সরকার তো কৃপা করছেন যাতে লোভের বশীভূত হয়ে অধিক সংগ্রহ না করতে পারেন। এইভাবে সরকার ক্রিয়াত্মক উপদেশ দিচ্ছেন। অতএব সাধারণ খরচা করুন, সাধারণ রোজগার করুন এবং

জীবনধারণ করুন। তাহলে আপনাকে দিয়ে কেউ পাপ করাতে পারবে না। কিছু টাকা রোজগার পর্যন্ত ট্যাক্সের ছাড় দেওয়া আছে না ? সেই পর্যন্ত রোজগার করো। অনেকে বলেন খরচ কি করে মেটাব, মেয়ের বিয়ে কেমন করে দেব ? মুশকিল হয় সামাজিকতা বজায় রাখতে। আমার বক্তব্য যে সামাজিকতাকে জলে দাঁড়িয়ে তিলাঞ্জলি দিন, জল দিয়ে দিন। আমাদের সেই ধরনের সামাজিকতা বজায় রাখার প্রয়োজন নেই। তারজন্য অপমানিত হলেও আমরা ভয় পাব না। পুণ্য করার জন্য, শুভ কাজ করার জন্য, ধর্মের পথে চলার জন্য যদি লোকে নিন্দা করে, তো করুক।

ত্রিবিধিং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। (গীতা ১৬।২১)

আমাদের পতন ঘটাবার জন্য কাম, ক্রোধ এবং লোভ— এই তিন প্রকারের নরকের দ্বার আছে। যে ব্যক্তি এর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে, সে তো নরকেই যাবে। যদি ভগবানকে স্মরণ করে অনুতাপ করা হয় যে এখন থেকে আর এমন কাজ করব না, তাহলে সে নরকে যাবে না। যে মুহূর্তে জীবন শুধরে যায়, চেতনা হয় এবং বিচার দৃঢ় হয়ে যায় যে পাপ কখনো করব না, তাহলে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। ভগবানের কৃপায় তার বলও লাভ হবে, ধর্ম লাভ হবে এবং সে সন্ত হয়ে যাবে। বাহ্যতঃ সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক, গৃহস্থ হোক বা যাইকিছু হোক না কেন, ভগবান তো অন্তরের ভাব দেখে থাকেন—'**ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ**'। তিনি ভাবের ভোক্তা। যার ভাব নির্মল হয়েছে, সে তো নির্মল হয়েই গেছে। শুধু বাইরে থেকে নির্মল হওয়ার, ভালো হওয়ার চেষ্টা করলে দেরী হয়, কিন্তু এই রকম প্রত্যয় যদি একবার হয়ে যায় যে আমরা পাপ করব না, তাহলে এর দ্বারা খুব শীঘ্রই শুদ্ধ হওয়া যায়।

'**ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকা**' অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয় করে নেওয়া হয়েছে যে পরমার্থিক মার্গেই চলতে হবে, যা কিছু হোক না কেন। '**অপি চেৎ সুদুরাচারো**'— পাপীর থেকে পাপী হলে তাকেও '**সাধুরেব স মন্তব্যঃ**'— সাধু বলেই মানা উচিত, কারণ '**সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ**'— সে দৃঢ় নিশ্চয় করে নিয়েছে। সেই ভাব অনুসারে সে পবিত্র হয়ে যায়।

রহতি ন প্রভু চিত চুক কিয়ে কী। করত সুরতি সয় বার হিয়ে কী॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।২৮।৩)

আগে যে দোষ করা হয়েছিল, সেইসব কথা ভগবান মনে রাখেন না। যার উপযুক্ত ভাব এবং যে এইপথে চলতে চায়, ভগবান তাকে একশো বার স্মরণ করেন যাতে তিনি তাকে ভুলে না যান। এমন প্রভু থাকতে কিসের ভয় ? প্রকৃতভাবে অন্তর থেকে পাপকে ত্যাগ করো। এখন তো লোভে পড়ে পাপ করে থাকে ; কিন্তু ভবিষ্যতে কী দশা হবে ? এই ব্যাপারে কিছু বিচার করেছেন ? ধন এখানে পড়ে থাকবে, সম্পত্তি এখানে পড়ে থাকবে, কিন্তু তুমি তো চলে যাবে। সারাজীবন ধরে খরচ করতে পারবে না। পাপের দ্বারা উপার্জিত ধন খরচ করা যাবে না, বাকী পড়ে থাকবে এবং পাপ কর্ম পিছনে পড়ে থাকবে না, সঙ্গে যাবে এবং মহান দণ্ড ভোগ করতে হবে। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির তো শীঘ্রই চেতনা হওয়া উচিত এবং সেইজন্য কেবল বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে এখন থেকে পাপ করব না, অন্যায় করব না।

———o———

পরিবারে জীবন-যাপনের রীতি

প্রকৃতপক্ষে সংসারে অভিমান এবং মমতা ত্যাগ করা কঠিন মনে হয়। কিন্তু একটি কথা আপনাদের বলছি। যদি ভাই-বোন সকলে তা নিজেদের ঘরে পালন করে সেই অনুযায়ী জীবন-যাপন করে, তাহলে খুব অনায়াসেই অভিমান এবং মমতা ত্যাগ করা সম্ভব হবে। দুটি ব্যাপার নিয়ে ঘরে-ঘরে প্রায়ই সংঘর্ষ হয়ে থাকে। আপনি উপার্জন করবেন, কিন্তু আমি কেবল তা ভোগ করব। আরাম, আদর, সৎকার, সবকিছু যেন আমার লাভ হয় আর খরচ পরিশ্রম কেবল আপনি করবেন। এই ব্যাপার নিয়ে অবিরাম অশান্তি চলতে থাকে। যদি এইটা উল্টে দেওয়া যায়, অর্থাৎ উপার্জন আমি করব, ভোগ আপনি করবেন, কারণ আদর-সৎকার, মান-প্রশংসা এইসব তো নেওয়ার নয়, দেওয়ার। সুতরাং অপরকে সমাদর করুন, সম্মান দিন, আরাম প্রদান করুন, যত্ন করুন, তাঁর আজ্ঞা পালন করুন, তাঁকে সুখ প্রদান করুন। যদি পরস্পরের প্রতি এমন আচরণ করা যায়, তাহলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-সৌহার্দ্যের সম্পর্ক তৈরি হবে।

মানুষের স্বভাবই হল যে সে সর্বদা নিজের মনের ইচ্ছা পূরণ করতে চায় এবং নিজের মনের ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেলেই পরিতৃপ্ত হয়। তার ধনের, মানের, নামের—এই ধরনের বিভিন্ন কামনা হয়ে থাকে। কিন্তু সমস্ত কামনার মধ্যেও মূল কামনা হল এইটাই যে 'আমার মনের ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়'—এই কথাটা কিন্তু মোটেই ভালো নয়। নিজের মনের ইচ্ছা পূরণ করার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে যদি অপরের মনের ইচ্ছা পূরণ করার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় তাহলে কৃতার্থ হওয়া যায়। শুধু দুটি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাঁর ইচ্ছা ন্যায়সম্মত কিনা এবং তা নিজের সামর্থ্যের মধ্যে কিনা। এর একটি সরল উপায় আছে। এটা নিশ্চয় করে নিতে হবে যে আমি সংসার থেকে কিছু নেব না শুধু সংসারের সেবা করব। কেন করব ? কারণ যেহেতু

প্রথমে নিয়েছি, সেইজন্য এখন দিতে হবে। সংসারকে কেবল দেওয়া উচিত, সংসার থেকে কখনো নেওয়া উচিত নয়।

একটি মর্মের কথা বলছি আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল পরমাত্মাকে লাভ করা। সংসারে বাস করার একটি বিশেষ রীতি (নিয়ম) আছে। সেই নিয়ম যদি আমরা রপ্ত করতে পারি তাহলে পরমাত্মাকে খুব অনায়াসেই পাওয়া যাবে। প্রতিটি কাজের একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে যা অবশ্যই সকলের জেনে রাখা উচিত। সেইমত কাজ করতে পারলে খুব অনায়াসে সংসারে বাস করতে পারবেন এবং সংসারকে অতিক্রমও করে যাবেন। সেই পদ্ধতি বা বিদ্যা কী ? তা হল যার সঙ্গে যে ধরনের সম্বন্ধ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ী খুব তৎপরতার সঙ্গে তার প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করবেন এবং তার কাছ থেকে নিজের জন্য কোনো কিছুই আশা, কামনা, বাসনা রাখবেন না। কারণ কখনো জগত থেকে কোনো কিছুই পাওয়ার আশা না রেখে, দেওয়ার মনোভাব রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই মনুষ্য দেহ সুখ নেওয়ার জন্য পাওয়া যায়নি।

'এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাঈ।'

শরীর লাভ করার ফল হল অপরকে সেবা করা। মায়ের জন্য পুত্র হলে সুপুত্র হও। মায়ের সেবা করতে হবে। মায়ের কাছে যদি টাকা, গয়না-কাপড় থাকে তাহলে বলো— মা, যা তোমার কাছে আছে, তা আমার বোনকে দিয়ে দাও। ছোটো ভাই বা দাদাকে দিয়ে দাও। আমার প্রতি কেবল এই একটিই কৃপা করো যে আমার সেবা তুমি গ্রহণ করো। মা-বাবার সেবার দ্বারা মানুষ কখনো ঋণমুক্ত হতে পারে না। তাঁদের যত ঋণ আমাদের ওপর, তা আমরা কখনো শোধ করতে পারব না। ঋণমুক্ত কখনো হতে পারব না। কোনো উপায় নেই। তাহলে কী করা উচিত ? সেবার দ্বারা তাঁদের প্রসন্ন করো। তাঁদের প্রসন্ন করতে পারলে সেই ঋণ মাফ হয়ে যায়। মা যতটা কষ্ট সহ্য করেছেন, বালক ততটা পরিমাণে মায়ের সেবা কখনো করতে পাবে না। সব কিছু তো মা দিয়েছেন। কেউ হয়ত

বললেন যে আমি আমার চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি করে মাকে পরাব। তখন কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল—এই চামড়া কি তুমি বাজার থেকে নিয়ে এসেছ ? এটাও তো মায়েরই। এর ওপর তোমার কি করে অধিকার হল ? মায়ের কাছ থেকে তা পেয়েছ। আজ আমি বড় বড় কথা বলছি। লোকে আমাকে বিদ্বান, সজ্জন বলে থাকে। কিন্তু এই শরীর কার কাছ থেকে লাভ করেছি ? মায়ের কাছ থেকেই লাভ করেছি। মায়ের দ্বারা পালিত হয়েছি।

আপনি যতই বিদ্বান হোন না কেন, শৈশবে বসতে পারতেন না ; মা বসতে শেখালেন। হাত ধরে চলতে শেখালেন। নিজে খেতে পারতেন না, মা বসিয়ে মুখে গ্রাস তুলে দিতেন। খেতে শিখলেন। আমাদের সকলের একই দশা ছিল। সেই অবস্থায় মা পালন করেছেন এবং প্রচুর কষ্ট সহ্য করেছেন। খেলার সময় এখানে-ওখানে চলে যেতেন, লাফালাফি করতেন, গাছে চড়তেন, বিছে ধরার জন্য দৌড়তেন, আগুনে হাত দিতে চাইতেন। এই সব বিপদ থেকে মা রক্ষা করেছেন। মল-মূত্র নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। এখন এইসব ভেবে দেখলেও মনে কুণ্ঠা জন্মে। কিন্তু সেই সময় কোনো রকম হুঁশ ছিল না, মা হাতে ধরে সব কিছু শিখিয়েছেন। খুব যত্ন করে পালন করেছেন।

কখনো-কখনো কোনো ভাইয়েরা অভিমানবশতঃ বলে থাকেন যে এ আর কি এমন বড় কথা ! তাঁদের প্রতি আমি বলি যে দু-চার দিন বাচ্চাদের পালন করে দেখুন, তখন ব্যাপারটি বুঝবেন। মায়ের মধ্যে মাতৃত্ব শক্তি আছে বলেই আমাদের পালন করা সম্ভব হয়েছে। সেইজন্য যতটা সম্ভব নিজের সামর্থ অনুযায়ী মা-বাবার সেবা করুন। যাঁরা জানেন না, দয়া করে তাঁদের বোঝান যে বড়দের সমাদর করা উচিত। যে ব্যক্তি মা-বাবাকে সমাদর করে না, ভগবানও তাকে সমাদর করেন না। এইরকম ব্যক্তিকে কেউ বিশ্বাস করবে না, কারণ যে মা-বাবার অনুগত নয়, সে তবে অন্য কার অনুগত হবে ? মা-বাবার সেবা করলে স্বয়ং ভগবান পরিতৃপ্ত হন। আজ্ঞাপালন করলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়। সেইজন্য ভাই-বোন প্রত্যেকেরই আজ্ঞা পালন করা উচিত। আজ্ঞা পালন করলে কী

হবে ? তাঁর সেবা করা হবে এবং তার দ্বারা আমি নিরহংকার হয়ে যেতে পারব। বস্তু পদার্থের দ্বারা সেবা করলে মমতাশূন্য হয়ে যেতে পারব। যে পরিমাণ বস্তু আমি সেবায় নিযুক্ত করতে পারব, সেই পরিমাণ মমতা তার প্রতি দূর হয়ে যাবে ; এবং যতটা পরিশ্রম করতে পারবে ততটা নিজের অহংকার নষ্ট হয়ে যাবে। ভোগ—বুদ্ধি এবং নিজের মধ্যে মহত্ত্বের অহংকার থাকলে পতন অনিবার্য। সংসারের সেবার দ্বারা খুব অনায়াসে অভিমান দূর হতে পারে। এইরকম মনোভাব নিয়ে সমবয়স্কদেরও সেবা-আদরযত্ন করুন। যাদের অবস্থা খারাপ, তাদেরও সেবা করুন। ছোটোদের পালন-পোষণ করাও এক ধরনের সেবা। সদাচারের শিক্ষা দেওয়াও একপ্রকার সেবা। বালকদের সৎ শিক্ষা দান করুন যাতে তারা আজীবন সুখে থাকতে পারে। ছেলে- মেয়েদের ভালো শিক্ষা দিন, যাতে তারা ভালো হতে পারে।

এইসব মায়েরা চাইলে সমগ্র সংসারের কল্যাণ করতে পারেন, কারণ আমরা যতজন ভাই-বোন আছি, সকলেই সর্বপ্রথম মায়ের কোলে থেকেই মানুষ হই। মায়ের কোলে খেলা করি। মায়ের দুগ্ধ পান করি। মায়ের স্বভাবের প্রভাব আমাদের ওপর পড়ে। মায়েদের যেরকম প্রকৃতি (স্বভাব) হবে, বালক-বালিকারাও সেইরকম তৈরি হবে, শিশুরা বড় হলে সেইরকম নাগরিক হবে, যার ফলে সেইরকম রাষ্ট্রের নির্মাণ হবে। শৈশবে মা যা শিক্ষা দেন, তা খুব কার্যকরী হয়। শৈশবের শিক্ষার সংস্কার খুব ফলপ্রসূ হয়। সুতরাং মায়েরা চাইলে অবশ্যই দেশে বড় সংস্কার করতে পারেন। মায়েদের মধ্যে যে মাতৃত্ব শক্তি আছে, তাঁরা সেটার প্রকৃত ব্যবহার করুন। ভগবান তাঁদের বিশেষ শক্তি দিয়েছেন। যারা ছোটো-ছোটো বালিকা, তারাও নিজেদের ভাই-বোনের পালন যেভাবে করতে পারে, বড় ছেলেরা কিন্তু তাদের ভাই-বোনের পালন সেভাবে কখনো করতে পারে না। আপনি ছোটো ভাই-বোনকে বড় ভাইয়ের কোলে রেখে দেখুন। বোনেরাই খুব ভালোবেসে পালন করে। বোনেরা তো নিজেদের খাবারও ছোটো ভাই-বোনদের খেতে দেয়। কিন্তু ভাই হলে সে নিজের খাবার

নিজেই খাবে এবং তাদের খাবারও খেয়ে নেবে। বালিকাদের মনে কখনো এই মনোভাব জাগে না যে এই জিনিসটা তো আমার, সুতরাং আমি কেন দেব ? তাদের মনে এই মনোভাব কেন জাগে না ? কারণ ভগবান তাদের পালন-পোষণ করবার বিশেষ শক্তি দিয়েছেন, এবং এই শক্তি তাদের মা হওয়ার জন্য প্রদান করেছেন। ভগবানের দেওয়া এই শক্তিকে যদি তাঁরা সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে খুব অনায়াসে তাঁরা মমতাশূন্য হয়ে যেতে পারবেন।

এর কারণ হল এই যে সকলের পালন-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকলকে সুখ প্রদান করার মাধ্যমে তাঁরা সহজেই মমতাশূন্য হয়ে যেতে পারেন। সেবা করলে অভিমান দূর হয়। এটা খুবই উঁচুদরের কথা। যদি ব্যবহারে এর প্রতিফলন হয়, তাহলে সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়ে যাবে। আপনারা কাজ-কর্ম ঠিক ভাবে করবেন। উপার্জিত বস্তু উদারতার সঙ্গে ভাগ-বণ্টন করবেন, অপরকে দেবেন। দুই প্রকার লোক আছেন যাঁদের বিশেষভাবে সমাদর করা উচিত। এক, যাঁরা উপকার করেন এবং দুই, যাঁরা গুরুজন, বৃদ্ধ এবং পূজনীয়। যাঁরা গুরুজন এবং বৃদ্ধ, তাঁদের সমাদর করা উচিত, তাঁদের আজ্ঞা পালন করা উচিত। যাঁরা দীন, রোগগ্রস্ত এবং অভাবগ্রস্ত, তাঁদের সেবা করা উচিত। ভগবান দীন-দুঃখীদের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেন। যদি তাঁদের সেবা করতে পারেন, তাহলে ভগবানও আপনার সেবা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। দীন-দুঃখীদের ঘৃণা করবেন না, দ্বেষ করবেন না, ঈর্ষা করবেন না। নিজের মধ্যে কোনো অভিমান রাখবেন না যে আমি অন্যের চেয়ে বড়। বাস্তবিক পক্ষে আপনি যে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান পোষণ করেন, সেটি তো সেই সাধারণ গরীব লোকদেরই কাছ থেকে লাভ করা হয়েছে।

এইজন্য সেই গরীবদের দান করলে ধনের প্রকৃত সদুপযোগ করা হয়। ধন থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ধনীদের সুখ প্রদান করে থাকে গরীবরাই। যাঁকে দেখলে আপনি প্রসন্ন হন, তাঁর সেবা করা তো আপনার কর্তব্য। যাঁরা গুরুজন এবং বৃদ্ধ তাঁরা আপনাকে পালন করেছেন, রক্ষা করেছেন, বিদ্যা

দান করেছেন, নানা শিক্ষা দিয়েছেন, সম্পত্তি দিয়েছেন। তাঁদের সেবা করা তো আপনার একান্ত কর্তব্য। সুতরাং, তাঁদের সেবা করুন। তাঁদের সুখ প্রদান করলে আমাদের এইসব ঋণ শোধ না করা গেলেও মাফ হয়ে যেতে পারে। সেবার দ্বারা অভিমানশূন্য হওয়া যায় এবং সংসারে থাকার কৌশলও আয়ত্ত করা যায়। এইরকম সকলের প্রতি প্রীতি ও সেবার ভাব রাখতে পারলে সংসারের লোকের কাছে প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। যে সেবা করে থাকে, তাকে সবাই ভালোবাসে।

মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন, তাকে নিজের আবশ্যকতা তৈরি করে নেওয়া উচিত। ভাই অথবা বোন, সাধু অথবা গৃহস্থ, যে কেউই হোন না কেন, নিজের আবশ্যকতা নিশ্চয় তৈরি করে নেওয়া উচিত, যাতে সংসারে শান্তিতে বাস করা যেতে পারে। আবশ্যকতা কি করে তৈরি হবে ? একটি উপায় হল প্রতিটি মুহূর্ত সৎ কাজে নিযুক্ত করা। সময় হল খুবই মূল্যবান। বস্তুত সময়ের মতন মূল্যবান বস্তু আর কিছু নেই। আপনি সময় ব্যয় করে বিদ্বান হতে পারেন, সময় ব্যয় করে ধনী হতে পারেন। সময় ব্যয় করে খুব কীর্তিমান হতে পারেন, আবার সংসারী হতে পারেন। এবার মনোযোগ দিয়ে শুনুন। সময় ব্যয় করে সব কিছু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সব কিছু দিয়েও কখনো সময় পাওয়া যাবে না। যদি কেউ বলেন যে সারাজীবন ধরে যা কিছু সংগ্রহ করেছি এক মিনিট সময়ের বিনিময়ে তা দিয়ে দিতে রাজী আছি, তবুও তার বিনিময়ে এক মিনিট সময়ও পাওয়া যাবে না। সময় ব্যয় করলে সব কিছু পাওয়া যেতে পারে ; কিন্তু সব কিছু দিয়ে দিলেও সময় কখনো পাওয়া যাবে না। সুতরাং সময় কতই না মূল্যবান ! ভাগবতে বলা হয়েছে—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ (১।১৮।১৩)

ভগবদ্ভক্তের ক্ষণিক সঙ্গ লাভও পরম মঙ্গলজনক। তার সঙ্গে মুক্তি অথবা স্বর্গ— উভয়ের কোনো তুলনা করা যায় না। গোস্বামী তুলসীদাস মহারাজও বলেছেন—

তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ ধরিয় তুলা এক অঙ্গ।
তুল ন তাহি সকল মিলি জো সুখ লব সৎসঙ্গ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪)

সন্তের ক্ষণিক সঙ্গলাভের সঙ্গে স্বর্গ এবং মুক্তিরও কোনোরকম তুলনা হয় না। সময় এতটাই মূল্যবান। অতএব সময় পাওয়া গেলে তা বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়। এই সময় উত্তম এবং মহৎ কাজে নিযুক্ত করুন। লোকে তো খুব যত্ন করে ধন রক্ষা করে, সিন্দুকে বন্ধ করে রাখে। ধন তো সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা যায়, কিন্তু সময় তো সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা যায় না। সময় দিলে ধন পাওয়া যায় কিন্তু ধন দিলে সময় পাওয়া যায় না। সর্বদা সাবধান হতে পারলেই সময়ের নিয়োগ সার্থক হবে। নতুবা সময়ের নিয়োগ নিরর্থক হবে। যাঁরা সময়ের মূল্য দিয়েছেন, তাঁরা সকলে অতীব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে পরিণত হয়েছেন। যাঁরা প্রকৃত সন্ত হতে পেরেছেন, তাঁরা সকলে কি করেছেন ? জীবনের সময় ভগবৎ-চরণে নিয়োগ করেছেন। তাঁরা সংসারের ভোগের প্রতি বিমুখ হয়ে পরমাত্ম তত্ত্ব জানার জন্য সময় নিয়োগ করেছেন। ফলে সন্ত এবং মহাত্মা হয়ে গেছেন। এই সংসারে সময়ের মতন মূল্যবান আর কোনো কিছু নেই। সময়ের নিয়োগ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তখনই হয় যখন ক্ষণিকের জন্য হলেও সৎসঙ্গ লাভ হয়ে, সাধু-মহাত্মার সঙ্গ লাভ হয়, ভগবানের সঙ্গ লাভ হয়, ভগবৎপ্রেম লাভ হয়, ভগবানের প্রতি আকর্ষণ হয়।

অতএব সময় সর্বদা উত্তম কাজে নিয়োগ করুন। স্বাধ্যায় করুন, জপ করুন, কীর্তন করুন, সেবা করুন। সৎ-গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং পাঠ করুন। বিষয়-ভোগ, তাস, হাসি-ঠাট্টা, নাচ-তামাশা-সিনেমা, বিড়ি-সিগারেট প্রভৃতিতে সময় নষ্ট করবেন না। আপনারা অনেকে বিড়ি-সিগারেট, মদ প্রভৃতি খেয়ে থাকেন। একটু বিচার করে দেখুন, আপনার যা সময় আছে, তাতেও এইভাবে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন, তাকে ধোঁয়ায় পরিণত করছেন ! সব ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে ! আপনার যা সময় আছে তাও এইভাবে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। পাঁচ-সাত মিনিট ধরে আপনি বিড়ি-সিগারেট খেলেন এবং

সেই সময়ও ধোঁয়ায় পরিণত করলেন। পয়সা তো গেল, সময়ও গেল এবং স্বাধীনতাও গেল। কী দুঃখের কথা ! আরে ! এতে কি লাভ হল ? কোনো ধরনের লাভই তো হল না। বরং যারা খায় না, তাদের আপনি দূষিত করলেন। তাদের ফুসফুস ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিলেন।

একজন সন্তকে কেউ প্রশ্ন করেছিলেন—মহারাজ ! আপনি বিড়ি খান ? উত্তরে উনি বললেন— আমি তো খাই না, কিন্তু লোকে আমাকে খাইয়ে দেয়। যখন গাড়িতে গিয়ে উঠি, তখন সেখানে লোকে বিড়ি খায়। এখন কি করব ? সুতরাং যারা খেতে চায় না, তাদেরও লোকে এমনি করে খাইয়ে দেয়। এইভাবে তাদের বিরক্ত করে, দুঃখ দেয়। একটা কথা আছে— **'পর হিত সরিস ধর্ম নহিঁ ভাঈ। পর পীড়া সম নহিঁ অধমাঈ॥'** অন্যকে দুঃখ দিয়ে আপনার কী লাভ হল ? অন্যের স্বতন্ত্রতাতেও বাধা দিলেন এবং নিজে আপনি একেবারে পরতন্ত্র হয়ে গেলেন, তাও ধোঁয়ার ! এমন ব্যর্থ কাজে সময় লাগানো। আক্ষেপের ভাষাই নেই !

এই সময়টুকু ভগবানের জন্য নিয়োগ করলে আপনার ভগবান লাভ হবে। আপনি ভক্ত হয়ে যাবেন। যার জন্য ভগবান বলেছেন—**'মৈঁ হুঁ সন্তন কা দাস ভগত মেরে মুকুটমণি'**। কে মুকুটমণি হয়ে যাবেন ? যিনি ভগবানের চরণে সময় নিয়োগ করেছেন। ভগবানও তাঁর আদর করে থাকেন। তিনি কী করেছেন ? কেবল নিজের সময়টুকু ভগবানের চরণে নিয়োগ করেছেন। সুতরাং এমন সময় কি এইভাবে নষ্ট করার জন্য ? শুধু তাস খেলে, জুয়া খেলে সময় নষ্ট করলেন ? রাম ! রাম ! রাম ! রাম ! বিদ্যা অধ্যয়ন করলে, সেবা করলে, পরের উপকার করলে তো সময়ের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা হয়। কত মহৎ কাজ করা হয়। সেই সময় এইভাবে নষ্ট করলেন ! এই সময় তো এইভাবে নষ্ট করার জন্য কখনো লাভ করা হয়নি।

আমাদের ভগ্নীদের দশা কী ? এখান-ওখান কার কথায় তারা সময় কাটিয়ে দেয়। ঘরে কোনো কথা বলার লোক না পাওয়া গেলে তারা পাশের বাড়ি চলে যায় কথা বলার জন্য। সেখানেই সময় কাটিয়ে দেয়। যদি তারা নাম-জপ করে, কীর্তন করে, রামায়ণ পাঠ করে, সারাদিন রাম-রাম করে,

তাহলে তারা ধন্য হয়ে যাবে। ভক্তিমতি মীরা মুক্ত হয়ে গেলেন। এর কারণ কী ? তিনি ভগবানকে ভজনা করেছিলেন। তিনি ভগবানের ভজনে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাই আজ মীরার রচিত পদ ঘরে ঘরে গাওয়া হয়ে থাকে। তার দ্বারা ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয়। সুতরাং কতটা মহৎ হয়ে গেলেন ভক্তিমতি মীরা ! কীভাবে সংসারে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন ! তাঁর নাম কত পবিত্র ! কিন্তু যদি কাউকে জিজ্ঞেস করো মীরার শাশুড়ির নাম কি ? তাহলে উত্তর পাবে—জানি না। ভজন করতে পারলে জীব কত মহৎ হয়। সুতরাং নিজের সময়কে সার্থক করুন। মহৎ, কল্যাণজনক এবং শ্রেষ্ঠ কাজে সময় নিয়োগ করুন। সময় কখনো নষ্ট করবেন না। এটি হল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা—যে কোনো কাজ করবেন, তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করবেন। কাজ করার পদ্ধতি, কাজ করার বিদ্যা ক্রমশ উন্নত করতে চেষ্টা করবেন। লেখা-পড়া, কথা বলা, রান্না করা, কাপড় ধোয়া, ঘর সাফ করা, ঝাঁট দেওয়া, বাসন ইত্যাদি ধোয়া খুব যত্নের সঙ্গে করবেন, খুব সুন্দরভাবে করবেন। সুচারুরূপে করলে প্রতিটি কাজ ভালো হবে। যদি চাকরি করতে হয়, তাহলে চাকরির কাজ এমন ভালোভাবে করবেন যাতে মালিক খুশি হয়ে যান। যদি মালিক কখনো রাগবশতঃ আপনাকে বরখাস্ত করে দেন তাহলে চাকরি তো ছাড়তে হবে, কিন্তু আপনি সেখানে কাজ করে যে বিদ্যা রপ্ত করেছেন, সেটা কি তিনি কখনো ছিনিয়ে নিতে পারবেন ? নীতিশাস্ত্র মতে ব্রহ্মাও তা কখনো ফেরত নিতে পারবেন না। আপনার কাজ করার যোগ্যতা, আপনার স্বভাব কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এইসব গুণ তো আপনার কাছেই থাকবে। এটা কত বড়ো কথা।

অল্প সময়ে, অল্প খরচে ভালো কাজ করতে পারবেন—আপনার এমন স্বভাব তৈরি হলে সকলে খুশি হবে, প্রসন্ন হবে। গৃহস্থদের কাছ থেকে এমন কথা আমি শুনেছি, যে সব মা-বোনেরা ভালো ভাবে জিনিস বানাতে পারেন, সকলে তাঁদের আদর করেন, কিন্তু এই বিষয়ে অভিমান করা কখনো উচিত নয়। অভিমান তো পতন ঘটায়। **'নির্মমো নিরহংকারঃ'** অহংকার তো ছাড়তে হবে। আরে ! কাজ-কর্ম করে তারপর সেটা নিয়েও

অহংকার করে থাকেন ! অতএব সুন্দর রীতিতে কাজ করুন, সুচারুরূপে কাজ করুন। মান-সম্মানের জন্য নয়, টাকা-পয়সার জন্য নয়, খ্যাতি লাভ করার জন্য নয়। নিজের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করার জন্য, নির্মল করার জন্য যাতে ভগবানের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি হয়। প্রেম বৃদ্ধি করার জন্য কাজ-কর্ম করুন, সেবা করুন। কাজে চাতুর্য বাড়াতে পারলে আপনার চাহিদা হবে।

তৃতীয় কথা —ব্যক্তিগত খরচ নিজের সাধ্যমতো করুন। দান-পুণ্য করুন। বয়োঃজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধদের রক্ষা করুন। দীন ব্যক্তিদের রক্ষা করুন। অভাব-গ্রস্তদের দান করুন। সেবা করুন, কিন্তু নিজের শরীর নির্বাহের জন্য সাধারণ বস্ত্র, সাধারণ ভোজন, সাধারণ বাড়ি—এর মাধ্যমে নিজের জীবন নির্বাহ করুন। ভাই-বোন সকলের জন্য এটা খুব প্রয়োজনীয় কথা। যে ব্যয়বহুল জীবন যাপন করে সে পরাধীন হয়ে যায়। খরচ কম করা তো নিজের আয়ত্তের মধ্যে থাকে কিন্তু অধিক উপার্জন করা কখনো নিজের আয়ত্তের মধ্যে নয়। আজকাল তো লোকে খরচ করে থাকে বেশি এবং উপার্জনের জন্য মিথ্যা-কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা ছলনা, প্রবঞ্চনার সাহায্য নিয়ে থাকে। এভাবে কী বেশি উপার্জন করা যেতে পারে ? অধিক উপার্জন করা তো আয়ত্তের মধ্যে নেই, বরং খরচ কম করা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। যেটা আয়ত্তের মধ্যে আছে সেটা করা হয় না আর যা আয়ত্তের মধ্যে নেই, তা পাওয়া যায় না। ফলে সারাজীবন ধরে দুঃখ পেতে হয়। এই কথাটা আপনারা অনুধাবন করুন যে নিজেদের ব্যক্তিগত কম খরচের দ্বারাই আপনারা জীবন-যাপন করতে পারবেন। খুব রাজকীয় খাবার খান অথবা সাধারণ ডাল-রুটি খান, জীবন-নির্বাহ হয়ে যাবেই। যদি শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে ঔষধ খান। নির্বাহের দৃষ্টিতে দেখলে এটা দোষের না হলেও স্বাদ এবং শৌখিনতার প্রতি দৃষ্টি থাকা মোটেই ঠিক নয়। ব্যয় কম হলে, আয়-ব্যয়ে সমতা থাকলে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয় না, যা স্বতন্ত্র জীবন যাপনের জন্য খুবই জরুরী।

আজকাল ধন উপার্জন করাকে বড় কৃতিত্ব বলে গণ্য করা হয়। লোকে বলে যে অমুক ব্যক্তি খুব চালাক, কত ধন উপার্জন করতে পেরেছে।

আরে ! কী ধন উপার্জন করেছে ? সে তো নিজের জীবন ব্যয় করে ফেলেছে। আপনি মরে গেলে একটি কড়িও সঙ্গে যাবে না। ধন উপার্জনের জন্য আপনাকে যে সব মিথ্যা ঠকানো, প্রবঞ্চনা, ধোঁকাবাজী, বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতিকে আত্মজ করতে হয়েছে, সে সমস্ত আপনার অন্তঃকরণে জমা হবে এবং ধন গচ্ছিত হবে আপনার ব্যাঙ্কে, আলমারিতে, বাক্সের মধ্যে। ধন কখনো আপনার সঙ্গে যাবে না। কিন্তু ধন সংগ্রহ করার জন্য যে যে পাপ আপনাকে করতে হয়েছে, সে সমস্ত আপনার সঙ্গে যাবে। সুতরাং এই পাপের বোঝা আপনাকে মাথায় বহন করতে হবে, আপনার সঙ্গে যাবে। আপনি কালো-বাজার থেকে ধন উপার্জন করলেন, আয়-কর ফাঁকি দিলেন, বিক্রী-কর ফাঁকি দিলেন, খুব চালাকি করলেন। কিন্তু সত্যই কী করলেন ? নিজের মহানাশ করে ফেললেন। নিজের মহা পতন ঘটিয়ে ফেললেন। আপনার সঙ্গে যাবার পুঁজি নিজেই নষ্ট করে ফেললেন এবং তার বদলে যা সংগ্রহ করে নিলেন তা সব ছেড়ে যেতে হবে। মরার পর কিছুই আপনার সঙ্গে যাবে না। আপনার সমস্ত পার্থিব সম্পদ এখানেই পড়ে থাকবে। আপনার উত্তরাধিকারীরা তা ভোগ করবে এবং বিনিময়ে দুঃখ পাবেন আপনি। নরকে যেতে হবে আপনাকে। এটা কি ধরনের বুদ্ধিমত্তা ? এটা কি কোনো বুদ্ধিমানের কাজ ? এটা কত বড়ো অজ্ঞতা এবং মূর্খতা। তাহলে এখন আপনার কী করা উচিত ? এখন থেকে পাপ কাজ করা ছেড়ে দিন। এই মুহূর্ত থেকে প্রবঞ্চনা ঠকানো, মিথ্যা-কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ধোঁকাবাজী আর কখনো করবেন না। নিজে পরিশ্রম করে যা উপার্জন করবেন তার দ্বারা জীবন যাপন করবেন। কিন্তু কখনো পাপ করবেন না। এটাই হল চতুর্থ কথা।

কেউ কেউ এমন কথাও বলেন, আগে যে পাপ করা হয়েছে তা তো করা হয়েই গেছে, সুতরাং কলঙ্ক তো লেগেই গেছে। তাহলে এখন ধন উপার্জন ছাড়ব কেন ? এটা কী কোনো বুদ্ধিমানের কথা হল ? আরে ভাই ! মনে করুন আপনি সবে খেতে শুরু করেছেন। তখন কেউ আপনাকে বলল যে এটা কী করছেন ? খাবারে তো বিষ মেশানো আছে।

তাহলে আপনি তাকে কখনো এই কথা বলবেন না যে তুমি আগে কেন বললে না, এখন তো আমাকে খাবার খেতেই হবে। বরং এই কথা শুনে তক্ষুণি হাত থেকে আপনি খাবার ফেলে দেবেন এবং পেটের খাবার বমি করতে শুরু করবেন। ভাববেন, যেটুকু খাবার খেয়ে নিয়েছেন সেটুকুও বেরিয়ে গেলে ভালো হয় !

শ্রোতা—মহারাজ ! আপনি তো কোনো খবরই রাখেন না যে আজকাল মিথ্যা-কপটতা ছাড়া জীবন নির্বাহ করা সম্ভব নয়। আইন এইরকম তৈরি হয়েছে, সংসারও এইরকম পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সুতরাং এইসব ছাড়া কাজ চলে না।

মহারাজ—আচ্ছা ভাই ! কাজ চালাতে চাও, কতদিন চালাবে ? কুড়ি বছর, পঞ্চাশ বছর, একশো বছর ! কতদিন চালাবে ? এতটা সময়ও পাওয়া যাবে না।

শ্রোতা—যদি উপার্জন না করতে পারি তাহলে তো মরে যাব ?

মহারাজ—এতে কিসের ক্ষতি হবে ভাই ! আজ না হয় পাপ না করেই মরে গেলে। পরে একদিন মরতে তো হবেই, তাহলে সঙ্গে পাপের গাঁটরি বেঁধে কি করবে ? আরে ভাই ! পাপ না করেই মরে যাও, ক্ষতি কী ? পাপ করার জন্য কি মানব-শরীর লাভ হয়েছে ? পাপ করব না, অন্যায় করব না, ভগবানের দিকে অগ্রসর হব, এইপ্রকার দৃঢ় সংকল্প করে নিয়ে অনেকে মুক্তিলাভ করেছেন। ভাই ! সময় ভালো কাজে নিয়োগ করো, উত্তম কাজ করো। নীচ কাজ কোরো না। প্রত্যেক ভাই-বোনের উচিত কখনো পাপ না করা। অন্তঃকরণকে মলিন না করা। সজ্জনবৃন্দ ! অন্তঃকরণকে নির্মল রাখুন। এই জীবন পবিত্র হয়ে যাবে। এই জন্যেই এই মানব-শরীর লাভ করা গেছে। সুতরাং সর্বদা উত্তম এবং উৎকৃষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। অন্যায়পূর্বক কাজ কখনো করা উচিত নয়। সততার সঙ্গে নিজেদের জীবন-নির্বাহ করা উচিত।

আজকাল বিয়ের সময় ছেলেদের নিলাম করা হয়। মেয়ের বাবা নিজে বলতে লজ্জা পান, অপরকে অনুরোধ করেন যে ওনার ছেলে আছে,

আপনি কথা বলুন। আমার মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করুন। অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, অমুকের মেয়ে আছে, আপনি বিয়ের সম্বন্ধ করুন। জবাবে হাজার হাজার টাকা দাবী করা হয়। আজকাল এই দশা ! কন্যাকে এইভাবে অপমান করা, স্ত্রীজাতিকে এইভাবে অপমান করা কখনো ঠিক নয়। কোন ব্যাপারে ? পয়সার বদলে। আরে ! পয়সা তো আজ আছে, কাল নেই। পয়সা তো নষ্ট হয়ে যাবে। এটা কত বড় দুঃখের কথা যে পয়সার বদলে মানুষকে এইভাবে অপমান করা হয়। কত বড় পাপ এবং অন্যায়ের কথা। ভাই এবং বোনদের কাছে আবেদন যে ছেলেকে বিয়ে দিতে হলে ভদ্র ঘরের মেয়ের সঙ্গে দিন। সে গৃহস্থালির কাজ-কর্ম সামলাবে, ভালো ব্যবহারও করবে। অহংকারী ঘরের মেয়ে হলে সে কাজ-কর্ম তো করবেই না, বরং কর্ত্রী হয়ে নানা ভাবে নিজের অধিকার ফলাবে।

একটি মেয়ের কথা আমি শুনেছিলাম। তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি ছিল গরীব ঘরের এবং ছেলের পক্ষ বেশি পণ দাবী করেছিল। মেয়েটির তাতে খুব রাগ হয়েছিল এবং সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিল, বাবা ! আপনি ধার করে আমার বিয়ে দিয়ে দিন, এখন কোনো কথা নয়, পরে আমি সব ঠিক করে নেব। কিন্তু আপনি আমাকে দান হিসাবে দেবেন না। কন্যাকে ধার হিসাবে দিচ্ছি, এইভাবে দেবেন। যথারীতি মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর প্রচুর ধন দেওয়া হল।

বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে গিয়েই সে খাটে উঠে বসল এবং তার স্বামীকে হুকুম করল—'যাও, আমার জুতো নিয়ে এসো।'

'তোমার জুতো আমি আনব !' তার স্বামী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমার বাবা টাকা দিয়ে তোমাকে কিনেছেন। তা জানো কি না ?'

'কত টাকা দিয়ে ?'

'হাজার হাজার টাকা দিয়ে।' মেয়েটি উত্তর দিল।

তখন সেই ছেলেটি সেদিন খাবার খেল না। তার মা জিজ্ঞেস করল —ব্যাপার কি ? 'মা ! যাকে আমি বিয়ে করে নিয়ে এসেছি সে কিনা আমাকে

তার জুতো নিয়ে আসতে হুকুম করছে!'

'বৌমা! তুমি এইরকম কথা কেন বলেছ?' মা জিজ্ঞেস করল।

'আমার বাবা এত খরচ করেছেন এবং ধার করে খরচ করেছেন, সুতরাং এ তো আমার চাকর, তাই আমার জুতো একেই নিয়ে আসতে হবে।'

ছেলেটি বলল—'আমি জুতো আনব না, এবং যদি এই ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে আমি খাবার খাব না।'

'তুমি আমার বাবার চাকর, কারণ আমার বাবা টাকা দিয়েছেন। এটা তুমি জানো কি না? তুমি কি এমনি কেবল বিনামূল্যে এসেছ? কত টাকা জোগাড় করতে হয়েছে। ষোলো হাজার টাকা ধার নেওয়া হয়েছে।'

এইরকম কথা-বার্তা বিনিময় হওয়ার পর, অগত্যা ছেলেটির বাড়ির লোকেরা বাধ্য হয়ে টাকা ফেরত দিয়ে দিল এবং মেয়েটি তারপর প্রকৃত গৃহবধূর মতন জীবন যাপন করতে শুরু করল। কন্যারা হল লজ্জার প্রতিমূর্তি। তাদের এইভাবে অপমান করলে সমাজে বড় অনর্থ হয়ে থাকে।

এটা খুবই দুঃখের কথা যে আপনারা যথেচ্ছ খরচ করেন তারপর যখন অর্থাভাবে কাজ আটকে যায় তখন বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকেন। এটা কত বড় অন্যায়ের কথা। এর ফল খারাপ হবেই। যে অন্যায় করে থাকে তার আত্মা কখনো শান্তি পায় না। যে ধন অপরকে দুঃখ দিয়ে লাভ করা হবে, সেই ধনে সব কিছু জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।

গরুর দুধ খাওয়ার আগে তা ভালো করে ছেঁকে নিতে হয় যাতে কোনো রোঁয়া (রোম) না থেকে যায়। গরু তো প্রসন্নতার সঙ্গেই দুধ দিয়ে থাকে, কিন্তু রোম ছিঁড়ে গেলে গরুর রক্তবিন্দু নিঃসরণ হতে পারে। রোম এসে গেলে তাতে ক্ষতি কী? আরে, একটিও রোম ছিঁড়ে গেল গোমাতার কষ্ট হবে এবং দুঃখকষ্ট দিয়ে নেওয়া জিনিস খুবই অনিষ্টকারী হয়। সুতরাং বরপক্ষের লোকেদের বলা উচিত যে আমরা ধন নেব না, আমাদের কেবল কন্যাকে দিন। এই যে কন্যা দান নেওয়া হয়, এই কন্যা-দান নেওয়াওতো একপ্রকারের দান, খুব বিশেষ দান! কেন নেওয়া হয়? এর কারণ হল

আমরা এখন কন্যা-দান নিলে ভগবান পরে যখন আমাদের কন্যা সন্তান দেবেন তখন আমরাও কন্যা-দান করব। এইরকম রেওয়াজ আছে পণের জিনিসও ঘরে রাখা উচিত নয়। কুটুম্ব এবং পরিবারের অন্যান্যদের তা প্রদান করা হয়ে থাকে। মেয়েকে, ব্রাহ্মণকে, সকলকে তা ভাগ বণ্টন করে দেওয়া হয়। যাতে ঘরে কোনো জিনিস না পড়ে থাকে, তাই মিষ্টি ইত্যাদি পর্যন্ত বিলিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে নিজেদের কোনোরকম দায়বদ্ধতা থাকে না এবং লোকেও খুশি হয়ে থাকে।

বিয়ের পর বৌমার বাপের বাড়ি থেকে কোনো জিনিস এলে অনেক শাশুড়ি ননদ প্রভৃতিরা তার নিন্দা করে বলে যে কী সামান্য জিনিস পাঠিয়েছে ! বৌমা শুনে দুঃখ পায়। কারণ মায়ের নিন্দা শুনতে কি কারো ভালো লাগে ? মায়ের নিন্দা শুনলে মনে দুঃখ হয়। যখন সে একদিন কর্ত্রী হয়ে যাবে, তখন কিন্তু সে যেমন চাইবে তেমনই হবে। সেইজন্য তাকে ভালোবাসো, স্নেহ করো, খুশি রাখো। বৌমার ঘর থেকে যা জিনিস এসেছে তার সঙ্গে নিজের ঘরের জিনিস যুক্ত করে সকলের মধ্যে তা ভাগ-বণ্টন করো। লোককে বলো যে, তারা এইরকম বহু জিনিস পাঠিয়েছে। এই কথায় বৌমার মার নাম যশ হবে, যার ফলে বৌমা মনে শান্তি পাবে। আপনি বলবেন যে এইসব করতে গেলে তো টাকা লাগে। আরে, টাকা তো অবশ্যই লাগে, কিন্তু কুড়ি-পঞ্চাশ টাকা খরচ করতে পারলে মানুষ আপন হয়ে যাবে। বৌমা আপনার অনুগত হয়ে যাবে, সর্বদার জন্য অনুগত হয়ে থাকবে। একশো কিংবা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কাউকে যদি অনুগত করা যায় তাহলে সেটা কি লোকসানের হবে ? বরং খুবই সস্তা হবে। গভীরভাবে বিচার করুন। ব্যবহারও ভালো হবে, প্রেমও বৃদ্ধি হবে। বৌমাও এই দেখে খুশি হবে যে আমার শাশুড়ি আমার মাকে প্রশংসা করলেন। এত খরচ করলেন ! এর প্রভাব আজীবন থাকবে, সুতরাং ভাই ! অল্প-বিস্তর ত্যাগ করো। যারা চাষ করে তারা কত ভালো ভালো (ফসল) ক্ষেতের মাটিতে মিশিয়ে দেয়। কেন ? যাতে ক্ষেত প্রস্তুত হয়। এই প্রকারে আপনিও ত্যাগ করুন। তার ফল খুব ভালো হবে।

যেসব বস্তু পাওয়া গেছে তার সদুপযোগ করা উচিত। শিশুদের ঠিক মতন পালন করা উচিত, ভালো শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাদের এমন ভাবে তৈরি করা উচিত, যাতে তারা সদ্‌গুণী এবং সদাচারী হতে পারে। টাকা রোজগার করার বেলায় তো আপনার সময় আছে, কিন্তু ছেলে- মেয়ে কি করছে, কেমন করে মানুষ হচ্ছে, কি ধরনের শিক্ষা পাচ্ছে, এইসব বিষয়ের প্রতি আপনি খেয়ালই করেন না। আরে ভাই ! এটাই তো আসল সম্পত্তি। এরা সব প্রকৃত মানুষ তৈরি হলে সেটা বড় ব্যাপার হবে ! যাঁরা যাঁরা মহাপুরুষ তৈরি হয়েছেন, তাঁদের মায়েরা সকলে খুবই মহৎ ছিলেন। এমন সব মায়েদের ছেলেরা সব মহাপুরুষ তৈরি হয়েছেন। সন্ত-মহাত্মা হয়েছেন। বালকেরা মায়ের স্বভাব পেয়ে থাকে। সেইজন্য মায়েদের উচিত বালকদের ভালো শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু তাঁরা বিপরীত শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাঁরা বরং মেয়েদের এই শিক্ষা দেন যে, তোমার নিজের ধন তোমার কাছেই রাখবে কারণ যখন আলাদা হবে, তখন সেই ধন তো তোমার কাছেই থাকবে। তাঁরা মেয়েদের এমনও শিখিয়ে পাঠান যে শ্বশুরবাড়িতে তুমি কেন কাজ করবে, তোমার জা করবে, ননদ করবে। তুমি একেবারে কোনো কাজ করবে না। সুতরাং এর ফলে সেখানে তো কলহ হবেই, মনোমালিন্য হবেই। যখন আপনার বৌমা আসবে, তখন সেও যদি এমন শিখে আসে, তাহলে সেও তো এইরকমই ব্যবহার করবে, কাজ আদৌ করবে না। তখন আপনিই বলবেন যে আমার বৌমা কোনো কাজ করে না। আপনি ভালো করলে তো আপনার পক্ষে ভালো হবে। খারাপ করলে তো আপনার খারাপ হবেই।

'কলিযুগ হৈ ইস হাথ দে, উস হাথ লে, ক্যায়া খূব সৌদা নগদ হৈ।'

সেইজন্য আপনি আপনার মাতা-পিতা, শ্বশুর-শাশুড়ির আদর করুন, সেবাকরুন, সৎকার করুন যাতে আপনার প্রভাব সন্তানদের ওপর পড়বে। এর ফলে বৃদ্ধাবস্থায়ও তারা আপনার সেবা করবে। কিন্তু আপনি যদি এমন না করেন, অর্থাৎ আপনার গুরুজনদের যদি সেবা না করেন তাহলে আপনার সন্তানদের ওপরও প্রভাব পড়বে। তাদের স্বভাবও

এইরকম হয়ে যাবে। আপনি তো চিরকাল একইরকম থাকবেন না। বেঁচে থাকলে একদিন বুড়োও তো আপনাকে হতে হবে। সেইসময় তারা যদি আপনার সেবা না করে তখন আপনি বলবেন যে এরা আমার সেবা করে না, কথা শোনে না। প্রকৃতপক্ষে আপনারা নিজেদের গুরুজনদের কতটা সেবা করেছেন ? তাহলে এখন আপনারা কেন অপরের কাছে প্রত্যাশা করছেন ? সেইজন্য নিজেদের আচরণ শোধরানো উচিত।

আজকাল তো বাবা-মা বাচ্চাদের বিলাসিতা শেখান, ছলা-চাতুর্য শেখান। ছোটো ছোটো ছেলেদের চা খেতে দেন। আজকাল নাকি ছোটো ছেলেরা দুধ খেতে চায় না, দুধে মালাই থাকলে তাদের ঘৃণা হয়। এটা খুব আশ্চর্যের কথা ! আমার তো ছেলেবেলার কথা মনে আছে, দুধ খাওয়ার সময় আমি দুধ পরখ করে বলতাম যে এতে আবার কি আছে ! এর মধ্যে তো তারা (ঘিয়ের বিন্দু) একেবারেই নেই ! আজকাল তো ঘি কেউ খেতেই পারে না, কারো সাহসই নেই। তারা মালাইও খেতে পারে না। অতএব চা খায়। চা খেলে নানা ক্ষতি হয়, ঘুম হয় না। স্বাস্থ্য খারাপ হয়। চোখ খারাপ হয়, ঔষধ কাজ করে না বরং বিনিময়ে অধিক টাকা খরচ হয়। এইরকম দশা অনেকের হচ্ছে। সুতরাং ভাই ! এরকম করবেন না। গরুর পালন করুন, তাদের রক্ষা করুন। আপনাদের যেসব গরু আছে, তাদের যত্ন নিন। যদি দুঃসময়ে আপনারা গরুদের জন্য খরচ করেন তাহলে সেটা খুব ভালো হবে। নিজেদের সুবিধার জন্য আপনারা গাড়ি রাখতে পারেন কিন্তু গরু রাখতে পারেন না। কুকুর পালন তো করবেন, কিন্তু গরুকে পালন করবেন না। চমৎকার কথা ! হে কলিযুগ মহারাজ ! আপনি আজব লীলা দেখালেন ! এখন এই রকম দশা হয়েছে।

আপনারা ছোটো বাচ্চাদের কখনো কোন নেশায় অভ্যস্ত করবেন না। তাদের খুব বিলাসবহুল জামা-কাপড় পরিয়ে আপনারা খুশি হন এবং মনে করেন যে আমাদের বাচ্চারা ভালোভাবে মানুষ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বেচারাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য সাধারণভাবে নিজেও থাকবেন, ছোটো বাচ্চাদেরও সেইভাবে রাখবেন, ভালোভাবে কাজ

করবেন, উৎসাহ বজায় রাখবেন, সৎভাবে কাজ কর্ম করবেন। ছোটে বাচ্চাদের দিয়েও কাজ করাবেন। আপনার বাড়িতে চাকর আছে। চাকর রাখার প্রয়োজন থাকলে রাখবেন। কিন্তু চাকর রেখে কখনো চাকরের বশীভূত হয়ে যাবেন না। যেহেতু চাকর ভালোভাবে কাজ নাও করতে পারে, সুতরাং আপনাকে সমস্ত কাজ রপ্ত করতে হবে। আপনার চাকর যেসব কাজ করে, সেটা যদি আপনিও করতে জানেন তাহলে সে কখনো আপনাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। এখন রান্নার লোক যদি বলে—এতটা ঘি খরচ হয়েছে। তখন আপনি বলতে পারবেন— আরে ! আমি তো জানি এতটা ঘি কি করে খরচ হতে পারে ? আপনি কাজ করতে জানলে তবেই তো শাসন করতে পারবেন। নইলে তো আপনাকে শুধু বলতে হবে - এতটা খরচ হয়েছে ? হ্যাঁ সাহেব, খরচ হয়েছে। তখন কি করে এর সত্যতা সম্বন্ধে আপনি যাচাই করতে পারবেন ? আজকাল তো কাজ-কর্ম করাকে অনেকেই অসম্মানজনক বলে মনে করে থাকেন।

মাতা সীতা কাজ করতেন। তিনি রান্না করে লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে খুব যত্ন করে ভোজন করাতেন। স্বয়ং খেটে পরিশ্রম করে শাশুড়িদের সেবা করতেন। এইসব করার ফলে কি তিনি ছোটো হয়ে গিয়েছিলেন ? বরং কয়েক শত নয়, কয়েক হাজার দাসী থাকা সত্ত্বেও তাদের সামনেই তিনি নিজের ঘরের কাজ সম্পন্ন করতেন। ঝগড়া করাকে অসম্মানজনক না মনে করে ঘরের কাজ করাকে অসম্মানজনক মনে করা ; খুবই নিম্নস্তরের কথা। সুতরাং নিজের সময় ঠিকভাবে নিয়োগ করুন। ভালো অভ্যাস তৈরি হলে আপনার গ্রহণযোগ্যতা হবে। তখন সকলে আপনাকে চাইবে, ফলে আপনার আবশ্যকতা উৎপন্ন হবে। ঘরে এবং বাইরে সর্বত্র সবাই আপনাকে চাইবে। যদি এমন না করেন, তাহলে সময় তো হাত থেকে বেরিয়ে যাবে এবং অভ্যাসও খারাপ হয়ে যাবে। খারাপ অভ্যাস আপনার সঙ্গে যাবে, যার ফলে আপনার স্বভাবও নষ্ট হয়ে যাবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তা আপনার সঙ্গে থাকবে। যে নিজের স্বভাব নির্মল, শুদ্ধ করে নিতে পেরেছে, সে আসল কাজ সেরে ফেলেছে। নিজের সঙ্গে চলার আসল

পুঁজি সংগ্রহ করে নিয়েছে। স্বভাবকে শুদ্ধ করুন, নির্মল করুন। তাহলে কী হবে ? মমত্ব দূর হবে। সেবা করলে অহংকার দূর হবে। মমত্বশূন্য ও নিরহংকার হয়ে যাবেন। সংসারের কাজ করতে করতে উচ্চ থেকে উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যাবেন। সুতরাং লেগে পড়ুন। তাহলেই তো কাজ হবে। এইজন্য ভাইদের, বোনদের বিনীতভাবে বলছি যে আপনারা সৎসঙ্গ শুনুন এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের জীবন গঠন করুন। এমন জীবন গঠন করতে পারলে একদিকে জীবন-নির্বাহ হবে এবং অন্যদিকে মনেও শান্তি থাকবে। **'নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি'** (গীতা ২।৭১)। পরম শান্তি লাভ হবে। এইরকমভাবে ভগবদ্গীতা ব্যবহারে পরমার্থ শিখিয়ে থাকে।

যুদ্ধের সময় বলা হল—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ (গীতা ২।৩৮)

যুদ্ধের দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা যায়, যদি কাজকে ভগবানের বলে মনে করা হয় এবং তা উৎসাহের সঙ্গে করা হয়। যে সেবা করে সে পবিত্র হয়ে যায়। ভগবানের ভজনা সর্বদা করতে থাকো যাতে সদ্বুদ্ধি জাগ্রত হয় এবং ভগবানের স্মরণ সর্বদা বজায় থাকে।

———○———

পঞ্চামৃত

যেখানে আপনি বাস করেন, সেই গৃহকে তো আপনার নিজস্ব বাসস্থান বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে নিজের গৃহে বাস করার মধ্যে কোনো রকম মাহাত্ম্য নেই, কিন্তু ভগবানের দরবারে বাস করা তো খুবই মাহাত্ম্যপূর্ণ ব্যাপার। এই গৃহকে তো আপনি নিজস্ব বলে মেনে রেখেছেন। কিন্তু বাস্তবিক এটা তো প্রথম থেকে ভগবানেরই ছিল, এখনও ভগবানেরই এবং পরেও ভগবানেরই থাকবে। মৃত্যুর পর এই গৃহ কখনোই আপনার সঙ্গে যাবে না। এটা তো কেবল ভগবানেরই। সুতরাং এখন থেকে স্বীকার করে নিন যে আপনি ভগবানের গৃহে বাস করেন এবং সাক্ষাৎ ভগবানেরই গৃহে বাস করেন। হরিদ্বারে এলে আপনি বলেন—অহো ! এটা তো হরকী পৌড়ী। বৃন্দাবনে এলে বলেন ভগবানের লীলাভূমিতে এসেছেন। অযোধ্যায় এলে মনে করেন যে ভগবানের দরবারে এসেছেন। ভগবানের দরবার অথবা ভগবানের গৃহ বলে স্বীকার করে নিলে সেই গৃহই বৃন্দাবন হয়ে যায়। সর্বদা এই কথাটা স্মরণে রাখা উচিত যে আমি তো ভগবানের গৃহেই বাস করি এবং আমি তো ভগবানের প্রিয় সন্তান। আজ থেকে এই কথাটা স্বীকার করে নিন। আপনারা নিজেদের গৃহকে কখনো নিজস্ব বলে স্বীকার করবেন না। আরে ! এইসব তো ভগবানেরই গৃহ। কেবল এই মধ্যবর্তী সময়ের জন্য তা আপনার নিজস্ব বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। আগে থেকে তা ভগবানের ছিল এবং পরেও ভগবানেরই থাকবে। তাহলে মধ্যবর্তী সময়ের জন্য আপনার নিজস্ব কেমন করে হয়ে গেল ? আপনি তো অকারণে এতে নিজের নামের সীলমোহর লাগিয়ে রেখেছেন।

আরেকটি কথার প্রতি মনোযোগ দেবেন—যে কোনো কাজই করুক না কেন, তা সর্বদা ভগবানের কাজ মনে করে করবেন। চাষ করা, গৃহস্থালির কাজ করা, ভোজন, ভজন, কাপড় ধোয়া, স্নান করা, যা কিছুই

করা হোক না কেন, সমস্তই ভগবানের কাজ। এই শরীরটাও তো ভগবানের, সুতরাং ভগবানের সেবার জন্য এই শরীরের সমস্ত কাজ করা হয়ে থাকে। খাওয়া-দাওয়া করাও যেমন ভগবানের কাজ, সংসারের কাজ-কর্ম করাও তেমনই ভগবানের কাজ। সমস্ত জগৎ সংসারের মালিক হলেন ভগবান, অতএব সমস্ত শরীরের মালিকও তিনি। সুতরাং শরীর এবং সংসারের কাজ কার জন্য করা হল ? ভগবানেরই জন্য করা হল। কত আনন্দের কথা ! ভগবানের দরবাসে বাস করি এবং কাজ-কর্মও ভগবানেরই করি—এই হল দ্বিতীয় কথা।

এখন তৃতীয় কথা—বাড়িতে যে সমস্ত বস্তু আছে সে সবও ভগবানের। যদি ঘর ভগবানের হয় এবং আপনিও ভগবানের হন, তাহলে এইসব বস্তু কি করে অন্য কারোর হতে পারে ? মা এবং বোনদের উচিত ওই সব ভগবানের বস্তু দিয়ে রান্না প্রস্তুত করা এবং মনে মনে এই কথা ভাবা অহো ! আমি তো ঠাকুরের ভোগের জন্য প্রসাদ প্রস্তুত করছি। ঠাকুরকে ভোগ দিতে হবে ! ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে ঘরে যাঁরা-যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রত্যেককে ঠাকুরের নিজের লোক (নিকটজন) ভেবে প্রসাদ বিতরণ করতে হবে। তাঁদের সকলকে ঠাকুরের প্রিয় জন বলে মনে করতে হবে। আমি ঠাকুরের আদরের সন্তানদের ভোজন করাচ্ছি, এইরকম মনে করতে হবে। আমি তো প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরেরই সেবা করছি। যেমন কোনো শিশুকে আদর করলে তার মা খুশি হয়, ঠিক তেমনই ভগবানের সন্তানদের সেবা করলে ভগবানও খুশী হন। কত আনন্দের কথা ! ভগবানের বস্তু দিয়ে রান্না করা হল, ভগবানকেই ভোগ দেওয়া হল এবং ভগবানেরই সন্তানদের ভোগ, প্রসাদ বিতরণ করা হল। নিজে ভোজন করলেও ঠাকুরেরই প্রসাদ মনে করে ভোজন করবেন। এটা ঠাকুরজীর প্রসাদ। কত আনন্দের কথা।

তুম্হহি নিবেদিত ভোজন করহীঁ। প্রভু প্রসাদ পট ভূষন ধরহীঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ২।১২৮।১)

শুধু ভোজন করা নয়, গয়না পরলেও ঠাকুরকে নিবেদন করে পরা উচিত। ঠাকুরেরই কাপড় পরিধান করি। সমস্ত বস্তু প্রসাদরূপে গ্রহণ করলে

সব কিছুই তখন পবিত্র হয়ে যায়। আপনি অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, যখন ঠাকুরকে প্রসাদ নিবেদন করে সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয় তখন প্রত্যেকে হাত বাড়িয়ে দেয়। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কণিকা দিলেও তারা খুশি হয়ে যায়। তারা লাখপতি হোক অথবা ক্রোড়পতি হোক, আপনার সামনে হাত পাতে এবং আপনি তাদের প্রসাদের খুব ছোটো কণিকাও দেন, তাতেই তারা খুশি হয়ে যায়। তারা কি মিষ্টি খেতে পায় না ?

যদি কোনো লাখপতি অথবা ক্রোড়পতি আপনার কাছে প্রসাদ চায় এবং তাঁকে যদি আপনি বলেন যে চলুন, আপনাকে বাজার থেকে মিষ্টি কিনে দিচ্ছি ! তাহলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। সেই ধনী ব্যক্তি বলবেন যে আমি কি মিষ্টি খেতে পাই না ? আমাকে প্রসাদ দিন। তাহলে প্রসাদের কত মাহাত্ম্য আছে বলুন ? ঠাকুরেরই তো প্রসাদ। ঘরের সমস্ত জিনিস তো ঠাকুরেরই।

আপনারা যদি পালন করতে সম্মত হন তাহলে একটি বিশেষ লাভজনক কথা আপনাদের জানাচ্ছি। যদি কৃপাপূর্বক পালন করেন তাহলে বিশেষভাবে লাভবান হবেন। ঘরে যত ধনসামগ্রী আছে, তার ওপর তুলসীপাতা ছড়িয়ে দিন। যত গয়না, কাপড় আছে, সব কিছুর ওপর তুলসীপাতা ছড়িয়ে দিন। সিন্দুকে যত টাকা-পয়সা রাখা আছে, সমস্ত কিছুর ওপর তুলসীপাতা ছড়িয়ে দিন। ঘরের ওপরও ছড়িয়ে দিন। যত গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি আছে, সে সবের ওপরও তুলসীপাতা ছড়িয়ে দিন। ছেলে- মেয়েদের ওপরও ছড়িয়ে দিন। এরা কার ছেলে-মেয়ে ? ঠাকুরের।

একটি চমৎকার কথা আপনাদের জানাতে পারি, যদি আপনারা পালন করতে রাজী হন ! কিন্তু যখন করবেন, তখন তা আন্তরিকভাবে করতে হবে। যদি ছেলে দুরন্ত হয় এবং আপনার কথা না শোনে, তখন আন্তরিকভাবে তার প্রতি আপনার মমতা ত্যাগ করুন এবং মনে করুন যে এই ছেলে তো আমার নয়ই। এ তো ঠাকুরেরই। এর ফলে ছেলে সম্পূর্ণভাবে শুধরে যাবে। যেমন ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করলে খাদ্যবস্তু পবিত্র হয়ে যায়, গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও সমাদর করে থাকেন, ঠিক

তেমনিভাবে প্রকৃত আন্তরিকতার সাথে নিজের মমতা একেবারে ত্যাগ করে কেবল ঠাকুরেরই সন্তান বলে তাকে স্বীকার করে নিলে, সে শুদ্ধ হয়ে যাবে। পবিত্র হয়ে যাবে। এইরকম পালন করে দেখুন। একটাই শর্ত হল যে নিজেকে একেবারে মমতাশূন্য হয়ে যেতে হবে। মনে করতে হবে অন্য কোনো ভিন্ন জাতের ছেলের মতন এই ছেলেটাও ঠিক তেমনি। সে মরে গেলেও আমার ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না। সে তো আমার ছেলে নয়, ঠাকুরেরই ছেলে। যেহেতু ঠাকুরের ছেলে, অতএব সে তো কখনো মরে যেতে পারে না। এখানে মরে গেলে অন্যত্র জন্মাবে। ঠাকুরের সান্নিধ্যের বাইরে সে কখনো যেতে পারে না। এইরকম ভাব অনুযায়ী আচরণ করতে পারলে আপনার ছেলে পবিত্র হয়ে যাবে। একেবারে খাঁটি কথা। মমতাই হল মলিনতা। মমতার কারণে মলিনতা হয়। যদি দান-পুণ্য করেন তবে প্রদত্ত বস্তুর সঙ্গে নিজের কোনোরকম সম্বন্ধ স্বীকার করবেন না। **'দাতব্যামিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে'** (গীতা ১৭।২০)। 'অনুপকারিণে'র অর্থ এই নয় যে কেউ আমার উপকার না করুক। বরং যে পূর্বে কখনো উপকার করেনি এবং ভবিষ্যতেও যার কাছ থেকে প্রত্যাশা নেই, সেরকম কাউকে দান করুন। যার সঙ্গে নিজের স্বার্থের কোনোরকম সম্বন্ধ নেই তাকে দিন অথবা চাইলে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ না রাখুন। একই ব্যাপার। যোগফল একই হবে। যেখানে মমত্ব নেই, সেখানে সেবা করুন অথবা যেখানে সেবা করছেন, সেখান থেকে মমত্ব মিটিয়ে ফেলুন—একই ব্যাপার হবে।

আমি ভগবানের। ভগবানের দরবারে বাস করি। ভগবানেরই কাজ করি। ভগবানের প্রসাদ দ্বারা ভগবানেরই আপনজনদের সেবা করি। আমিও ভগবানেরই প্রসাদ পেয়ে থাকি—এই হল আসল পঞ্চামৃত। আজ থেকে এই কথাটা দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে নিন। **'সর্বভাবেন মাং ভজতি'** অর্থাৎ সমস্ত ভাব দ্বারা ভগবানেরই ভজনা করা। যখন যে ধরনের কাজই করুন না কেন, তা স্নান করা হোক বা শরীরকে শুদ্ধ করা হোক, তখন এই ভাব নিয়ে করুন যে এটা তো ঠাকুরের শরীর। আমি তো ঠাকুরেরই কাজ

করছি। তাহলে ঠাকুরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে বলতে পারবে
—মহারাজ ! আমি তো আপনারই কাজ করছি।

একজন ব্রাহ্মণ বলতেন— আমি প্রতিদিন একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাই। তিনি স্বয়ং ভোজন করতেন, কিন্তু এইভাব পোষণ করতেন যে রোজ একজন ব্রাহ্মণের সেবা করি। কত বড় কথা ! সমস্ত পরিবার তো ঠাকুরের। ঠাকুরের পরিবারকে আমি পালন করি। তাহলে ঠাকুরও নিশ্চয় বলবেন যে এ তো আমার পরিবারের পালন করে ! ভগবানের ওপরও এর প্রভাব পড়বে যে সত্যই তো, এটি তো ঠিক কথা। এ তো নিজের বলে কিছু মনে করে না, এর নিজের মমত্ববোধ বলেও কিছু নেই। এ তো আমার পরিবারেরই পালন করে।

সর্বভাবে আমি ভগবানেরই কাজ করি, এই বোধ জাগ্রত হলে তা অব্যভিচারী ভক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে। নিজের জন্য কিছু না নেওয়া, নিজের বলে কিছু মনে না করা। নিজের কোনো স্বার্থও নেই, মমতাও নেই। বাড়ির লোকে সমাদর করুক বা না করুক, সেবা করুক বা না করুক, আমাকে তো ঠাকুরের পরিবারের পালন করতে হবে। তাদের সেবা করতে হবে। ভাই ! পরিবারের লোক কাজ না করলেও সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যে খুব ভালো কথা। যদি কাজ করে, অনুকূল আচরণ করে, তাহলে বুঝতে হবে যে আমি যা করেছি তা শোধ হয়ে যাবে। এইজন্য যদি তারা কিছু না করে বরং শুধু দুঃখ দেয় তাও ভালো। যদি শাশুড়িও দুঃখ দেয়, বৌমাও দুঃখ দেয়, ভাসুর-দেওরের স্ত্রী, ননদ ইত্যাদি প্রত্যেকে দুঃখ দেয়, তবুও খুশি হওয়া উচিত এই ভেবে যে খুবই সৌভাগ্যের কথা ! আমার সেবার বিনিময়ে এরা যদি দুঃখ দেয় তাহলে দ্বিগুণ লাভ হবে। একদিকে তো সেবা করার লাভ হবে এবং অন্যদিকে এরা দুঃখ দেওয়ার জন্য পাপ কেটে যাবে। তাহলে দুঃখ কি করে থাকবে বলো ? দুঃখ পেলেও তখন আনন্দ হবে। দুঃখ বলে কোনো কিছুই থাকবে না, কোনো অবস্থাতেই দুঃখ পেতে হবে না। যিনি এটা অনুভব করতে পেরেছেন তিনি সর্ববিদ। তিনিই যথার্থ বুঝেছেন। নতুবা যিনি সংসারের প্রভাবে সুখী এবং দুঃখী হয়ে থাকেন,

তিনি এর তাৎপর্য বুঝতে পারেননি।

আমরা তো আনন্দে বিরাজ করি, কিঞ্চিৎমাত্রও কোনো দুঃখ নেই। ভগবান সকলের ভরণ-পোষণ করে থাকেন। সকলের পালন করে থাকেন। সুতরাং এমন ভগবানের ভক্তের কোনোরকম দুঃখ হয় না। তিনি সর্বদা আনন্দে পরিপূর্ণ থাকেন এবং এত আনন্দে থাকেন যে তাঁর সঙ্গ করলেই আনন্দ লাভ হয়। ঠাকুরকে স্মরণ করলে বন্ধন দূর হয়। তিনি এতই পবিত্র যে তাঁর নাম নিলে, তাঁকে স্মরণ করলে এবং তাঁর লীলা শুনলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়।

পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্।

মূল কথাটা কী ? একটি খুব ছোটো কথা। 'আমি কেবল ভগবানেরই', অন্য কারো নই। সেবা করার জন্যে আমি সংসারের, কিন্তু নিজের কাজ হাসিল করার জন্য কারোর নই। আমি কেবল ভগবানের। নিজেকে কেবল ভগবানের বলে মেনে নিলে ঘর, পরিবার, সম্পত্তি, কাজ, প্রসাদ— সমস্তই ভগবানের হয়ে যাবে। এইটা হল একেবারে খাঁটি কথা।

আপনাদের একটি প্রকৃত অনুভবের কথা জানাচ্ছি। যে বালককে মা নিজের বলে মেনে নিয়েছে, সেই ছেলে যখন দৌড়ে মায়ের কোলে উঠে পড়ে তখন মা হাসেন। যখন পিছনে গিয়ে মায়ের পিঠে উঠে পড়ে তখনও মা হাসেন এবং বায়না ধরে কাঁদলেও মা হাসেন। মা বলেন যে দেখো, আমার সঙ্গে কেমন ছলনা করছে ! সেই ছেলের এমন কোন্ ক্রিয়া আছে যার দ্বারা তার মা প্রসন্ন না হন ? সেই ছেলে যা কিছু করে, মা তাতেই খুশি হন। কারণ কী ? মা মনে করেন যে, এই ছেলে তো আমার। ঠিক এইরকমভাবে আমরা যদি ভগবানের হয়ে যেতে পারি, তখন যাই কিছু করি না কেন, আমাদের সব ক্রিয়াই ভগবানের ভজনে পরিণত হয়ে যাবে। ভজন কাকে বলে ? ভগবানের প্রসন্নতা সাধন করা। তখন যে কাজই করা হয়, ভগবান তাতেই খুশি হয়ে যান। আমার সন্তান ! আমারই সন্তান খেলা করছে। কত আনন্দের ব্যাপার !

কেবল একটিই কথা। ভগবানের হয়ে যাওয়া। এটাই আসল কথা। আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে আপনি কি নিজের ইচ্ছায় জেনে শুনে এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন ? আপনি কি নিজের ইচ্ছায় বেঁচে আছেন ? নিজের ইচ্ছায় যদি বেঁচে থাকেন তাহলে মৃত্যু কেন হয় ? তাহলে মৃত্যু হওয়া উচিত নয়। আপনি কি নিজের ইচ্ছায় জেনে শুনে সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন ? যদি জেনে শুনে বেঁচে আছেন তাহলে অসুস্থ কেন হয়ে পড়েন ? তাহলে বৃদ্ধ এবং পরাধীন যেন হয়ে যাবেন না। কিন্তু পরাধীন তো হয়ে যান। এইজন্য আপনার বৃথাই অভিমান করা। আর কিছুই নয়। সেইজন্য এই কথাটা মেনে নেওয়া উচিত যে আমি ঠাকুরের। আমি ঠাকুরের অধীনে। ঠাকুর যেমন শক্তি দেন, তেমনই করি।

হনুমানজী কত কাজ করেছেন ? শ্রীরাম যখন লঙ্কা গেলেন তখন সেতু তৈরি করে পার হলেন। কিন্তু হনুমানজী লাফিয়ে পার হয়ে গেলেন। তাঁর মধ্যে কার বল ছিল ? ঠাকুরের বল ! **'বার বার রঘুবীর সঁভারী।'** **'প্রবিসি নগর কীজে সব কাজা। হৃদয়ঁ রাখি কোসলপুর রাজা॥'** বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণনা আছে যে হনুমানজী এইরকম গর্জন করেছিলেন যেন হাজার রাবণ এলেও আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ আমি তো ঠাকুরের দাস।

নিজেদের অভিমান পোষণ করে জগতের সকলে দুঃখ পাচ্ছে। এইজন্য দয়া করে অভিমান ত্যাগ করুন, ভগবানকে সমর্পণ করে এই ভাব রাখুন যে আমি তো ঠাকুরের। আমার সমস্ত শক্তি ঠাকুরের কাজে লাগাতে হবে। **'ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে, সর্বভাবেন ভজতি মাম্'** সমস্ত ভাব দ্বারা ভগবানকে ভজনা করছি। নাম-জপ, কীর্তন, পাঠ, শোনা, বলা—সবই হল ভজন। সর্বোপরি **'সর্বভাবেন ভজতি'** ওঠা, বসা, খাওয়া, পান করা, শোয়া, জাগা, এই সবের দ্বারা ভগবানের কাজ করছি। কত উঁচু দরের কথা ! কত শ্রেষ্ঠ কথা ! কত সহজ কথা ! আপনি এখনই মেনে নিলে কৃতার্থ হয়ে যাবেন। আমি তো ভগবানে অর্পিত, সুতরাং কেবল ভগবানেরই কাজ করব। কাজ তো আমারই নয়। এই ঘর যখন আমার নয়

তখন এর কাজও কখনো আমার নয়। সমস্তই হল ভগবানের কাজ।

আমি সাধু-মহাত্মাদের কাছে শুনেছি যে যার নিজের বলে কিছু নেই, অর্থাৎ না মন নিজের, না বুদ্ধি নিজের, না শরীর নিজের, না প্রাণ নিজের, না ইন্দ্রিয় নিজের, না ঘর নিজের, না সম্পত্তি নিজের, বরং সমস্ত কিছু কেবল ঠাকুরের, সে যেখানেই থাকুক আনন্দে থাকে। সব ভগবানকে অর্পণ করে দিয়েছে। এইজন্য সে সর্বদা আনন্দে থাকে।

আমি একজন সন্তের ব্যাপারে একটি কথা শুনেছি। সন্তেরা খুব বিচিত্র হন। তিনি যখন বাজারে দেখতেন যে অনেক উৎকৃষ্ট রকমের মিষ্টি এবং ফল দোকানে সাজানো আছে তখন সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়তেন এবং মনে মনে বলতেন, হে ঠাকুর ! ভোগ গ্রহণ করুন। এই যে বরফী, অমৃতি, জিলিপি, লাড্ডু এই সবেরই ভোগ গ্রহণ করুন। এইভাবে তিনি দাঁড়িয়ে থেকে আনন্দের সঙ্গে ভোগ নিবেদন করে দিতেন। এইরকমভাবে আপনিও ঠাকুরকে অর্পণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করলে তা ঠাকুরকেই অর্পণ করা হবে। আপনি যদি বলেন যে এর দ্বারা কি লাভ হবে ? আপনিও করুন না ! কে বারণ করছে ? যেখানে উৎকৃষ্ট জিনিস দেখবেন, ঠাকুরকে অর্পণ করে দেবেন।

সমস্ত কিছু ঠাকুরের। আমরা তাহলে কি করব ? আমরা তো কেবল আনন্দ করব। এখন তো আমাদের নিজের বলে আর কোনো কাজ রইল না। কেবল ঠাকুরের কাজ করতে হবে, ঠাকুরের নাম, ঠাকুরের চিন্তন করতে হবে এবং ঠাকুরের কথা শুনতে হবে। আপনার কাজ বলে কি থাকল ? আপনি তো শুধু ঠাকুরের কাজ করেন। সমস্ত সংসারের মালিক হলেন ভগবান। মালিকের চরণে মালিকেরই জিনিস অর্পণ করার জন্য আপনাকে কি অধিক পরিশ্রম করতে হয় ? আপনি বলেন যে আমার আমার ; কিন্তু কত দিন, কত বছর ধরে আমার আমার বলছেন ? এবং আর কত বছর ধরে আমার আমার বলবেন ? আসলে তো তা ঠাকুরেরই থাকবে। বেঁচে থাকতে থাকতেই আপনি আন্তরিকভাবে ভগবানকে অর্পণ করে দিন, তাহলে কৃতার্থ হয়ে যাবেন। কত সহজ এবং কত বড় কথা !

সন্তের রচিত পদে আছে—

রাম নাম কী সম্পদা দো অন্তর তক ধূণ।
যা তো গুপতী বাত হৈ কহো বতাবে কূঁণ॥

কে এত উত্তম কথা জানাবে ! আর কত সহজ ! কত উঁচু ভাবের ! কত নিশ্চিন্তের, নির্ভয়ের, আনন্দের কথা ! কোনো চিন্তা নেই, ভয় নেই, উদ্বেগ নেই, বাঁচার ইচ্ছা নেই, মরার ইচ্ছা নেই। আমার নিজের কোনোরকম ইচ্ছা নেই। ঠাকুরের ইচ্ছাতে ইচ্ছা মিলিয়ে দিয়েছি। এখন ঠাকুর যেমন করেন, যেমন রাখেন।

জাহি বিধি রাখে রাম তাহী বিধি রহিয়ে।
সীতারাম সীতারাম সীতারাম কহিয়ে॥

নিজের কোনো চাহিদা নেই, কোনো ইচ্ছা নেই। এর ফলে আমার চিন্তা মিটে যাবে এবং ভগবান প্রসন্ন হয়ে যাবেন। আমার বলে মনে করলে চিন্তা থেকে যায়। যেমন, আমার ঘর। অমুক জিনিস সেখানে পড়ে আছে। সেখানে কাপড় শুকোচ্ছে। কেউ সেটা নিয়ে নিল কিনা, এমন চিন্তা হয়। কিন্তু ঠাকুরকে অর্পণ করে দিলে তখন কত আনন্দ হয় ! গেল তো ঠাকুরের, থাকল তো ঠাকুরের !

———○———

শরণাগতি

ভগবান শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভক্তিযোগ অর্থাৎ শরণাগতিকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। উপদেশও আরম্ভ হয়েছে অর্জুনের শরণ হওয়ার পর এবং অন্তিমেও বলা হয়েছে—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীতা ১৮।৬৬)

এর পূর্বে ভগবান **'গুহ্য'** বলেছেন, **'গুহ্যতর'** বলেছেন, **'গুহ্যতম'** বলেছেন এবং **'সর্বগুহ্যতম'** (১৮।৬৪) বলে জানিয়েছেন। সুতরাং সবচেয়ে গোপনীয় কথা বলেছেন **'মামেকং শরণং ব্রজ'**। একমাত্র আমার শরণাগত হয়ে যাও। অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে **'ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ ত্বাং পৃচ্ছামি'** অর্থাৎ আমার বুদ্ধি দিয়ে ধর্ম কী—সে সম্বন্ধে নির্ণয় করতে পারছি না, এইজন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।

ভগবান বলছেন যে যেটা তুমি নির্ণয় করতে পারছ না, সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। অর্জুন কিছুতেই নির্ণয় করতে পারছিলেন না যে যুদ্ধ করব নাকি করব না—সঠিক ধর্ম কোনটি। সুতরাং ভগবান বলছেন যে যদি তুমি এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ হও তাহলে বৃথা চিন্তা না করে আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। তুমি চিন্তা কোরো না। অতএব প্রকৃত শরণাগত হতে গেলে সব ধরনের আশ্রয় ত্যাগ করতে হবে, অপর কোনও আশ্রয়ে থাকা চলবে না। মনে মনে অন্য কারো প্রতি ভরসা রাখা এবং অন্য কারো আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়, এই সমস্ত ত্যাগ করে শুধুমাত্র একান্তচিত্তে ভগবানের শরণাগত হওয়া। এটাকেই সাধন এবং সাধ্য বলে মানা উচিত। এই হল শরণাগতির সবচেয়ে গোপনীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কথা।

এর মধ্যে একটা বিশেষ রহস্যের কথা আছে—**'অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'**—আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি দেব, তুমি

চিন্তা কোরো না। ভগবান এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছেন। এই কথাটির তাৎপর্য এই নয় যে তুমি শরণাগত হয়ে গেলে তোমার পাপ আমি নষ্ট করে দেব। অর্জুনকে লোভ দেখানো হয়েছিল এমন কথা নয়। তুমি অনন্যভাবে শরণাগত হও, ধর্ম নিয়ে চিন্তা করবে না, কারণ ধর্ম ত্যাগ করার ফলস্বরূপ পাপের দায়িত্ব হল আমার। গীতাতে বলা হয়েছে —**'নেহাভিক্রমনাশোস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে'** (২।৪০)। নিষ্কামভাবে যে কর্ম করে, তার কখনো বিপরীত ফল লাভ হয় না। তার দ্বারা কোনোরকম অধর্ম তো হয়ই না। তুমি কেবল আমার শরণাগত হও। তারপর কোনো চিন্তা কোরো না। শরণাগত হওয়ার পরও যদি মনে কোনো চিন্তা হয়, কোনো ধরনের বিপরীত ভাবনা উৎপন্ন হয়, মনও পরমাত্মায় নিয়োজিত না হয়, সাংসারিক পদার্থের প্রতি রাগ-দ্বেষও হয়ে যায়, তৎপরতা এবং নিষ্ঠা না দেখা যায়—এই ধরনের ন্যূনতা যদি অনুভব হয়, তবুও এই সব ন্যূনতার জন্য তুমি কোনোরকম চিন্তা কোরো না। ভগবানের শরণাগত হওয়ার পর কোনো রকম চিন্তা করা উচিত নয়। নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। নির্ভয় এবং শোকশূন্য হওয়া উচিত। নিঃশঙ্ক হওয়া উচিত। এখানে কি দশা হবে, পরলোকে কি হবে, এখানে যশ লাভ হবে, না অপযশ লাভ হবে, নিন্দা হবে, না প্রশংসা হবে, ঠিক হবে, না বেঠিক হবে, লাভ হবে, না হানি হবে, লোকে সমাদর করবে, না অপমান করবে— এই সবের কোন ভাবনাই করবে না। কেবল অনন্যভাবে আমার শরণাগত হও আর অন্য সমস্ত আশ্রয় ত্যাগ করো। তুমি ভয় কোরো না। শোকও কোরো না এবং শঙ্কাও কোরো না। যে বস্তু চলে গেছে তারই জন্য শোক হয় এবং তার কথা মনে হলে শঙ্কা হয়। শোকও ত্যাগ করে দাও। **'মা শুচঃ'** কথাটার তাৎপর্য হল যে তুমি কোনো ধরনের কিঞ্চিৎমাত্রও চিন্তা কোরো না।

আমি তো ভগবানের শরণাগত হয়েছি। যেমন কন্যা সম্প্রদান হয়ে গেলে কন্যা বুঝতে পারে যে তার বিয়ে হয়ে গেছে, একজনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয়ে গেছে। সারাজীবন ধরে এই সম্বন্ধ অটল, অখণ্ড থাকবে। এই সম্বন্ধ একবার স্থাপিত হয়ে গেলে স্বামী জীবিত থাকুক বা না থাকুক, সে

সমাদর করুক, অনাদর করুক, ত্যাগ করুক, সন্ন্যাসী হয়ে যাক, কিন্তু আমাদের ভারতীয় নারী এমনই যে যখন একবার কাউকে স্বীকার করে নিয়েছে, তখন সারাজীবনের জন্য তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। এরই দৃষ্টান্তস্বরূপ সাধু-সন্ত বলেছেন —'**পতিব্রতা রহে পতিকে পাসা। য়ূঁ সাহিবকে টিগ রহে দাসা ॥**' পতিব্রতা যেমন থাকে, দাসও ভগবানের কাছে তেমনিভাবে থাকে। দাসেরও একজনই মালিক ; একটিমাত্র ধ্যান-জ্ঞান—মালিকের ইচ্ছা পালন করা, তাঁর সেবা করা।

একই ধর্ম এক ব্রত নেমা। কায়ঁ বচন মন পতি পদ প্রেমা॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৩।৪।৬)

তার একটি মাত্র ধর্ম, একটিমাত্র ব্রত, একটিমাত্র নিয়ম—শরীর, মন, বাণী দ্বারা কেবল পতির চরণের প্রতি প্রেম জাগরূক করা। ঠিক এইরকমভাবে ভগবানের ধর্ম, ভগবানের আজ্ঞা, ভগবানের অনুকূলতা —এইটা হল ধর্ম। আমি কেবল ভগবানেরই, অন্য কারো নই। অন্য কারো নই—এর তাৎপর্য হলো কারো কাছ থেকে কখনো কিঞ্চিৎমাত্রও কিছুই না নেওয়া, কারো কাছ থেকে কিঞ্চিৎমাত্রও কিছু প্রত্যাশা না করা। যেমন পতিব্রতা নারী বাড়ির সকলের সেবা করে থাকে। শাশুড়ি, শ্বশুর, দেওর, ভাসুর, জা, ননদ প্রভৃতির সেবা করেন। ঠিক সময়ে অতিথি-সৎকার এবং সাধুদেরও ভিক্ষা দান করেন। কিন্তু নিজের সম্বন্ধ কারো সঙ্গেই নেই। দেওর, ভাসুর প্রভৃতির সঙ্গে যে সম্বন্ধ তা তো স্বামীর সূত্রেই হয়ে থাকে। কারো সঙ্গে তার কোনোরকম স্বতন্ত্র সম্পর্ক নেই। এইরকমভাবে ব্রত গ্রহণ করা উচিত যে কেবল ভগবানের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ এবং অন্য কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। কর্তব্য তো কেবল ভগবানের ভজনা করা এবং ভগবানের শরণাগত হওয়া। কেবল এইটাই কর্তব্য। এইরকম অনন্যভাবে ভগবানের শরণাগত হতে হবে, অন্য কারো কোনও আশ্রয় যেন না থাকে।

অন্যদের সেবা করা, কাজ করে দেওয়া, শাস্ত্রসম্মতভাবে সুখ প্রদান করা—এর মধ্যে কোনো দোষ নেই। দোষ হল নিজের জন্য কিছু চাওয়া। ভগবানের শরণাগত হয়ে যাওয়ার পর কারো কাছে কখনো কিঞ্চিৎমাত্রও

আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়। **'মোর দাস কহাই নর আসা। করই তৌ কহহু কহা বিস্বাসা॥'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৫।২)। যদি কেউ ভগবানের দাস বলে পরিচয় দিয়ে কারো কাছে কিঞ্চিৎমাত্রও আশা রাখে, তাহলে সে ভগবানের দাস কোথায় হল ? সে যে বস্তুর আশা রাখে, তারই দাস হল, ভগবানের দাস নয়। সে ধন, সম্পত্তির দাস, ভগবানকে তো কেবল বস্তু লাভের এক ধরনের সাধন বলে সে মনে করে। সে ভগবদ্‌ভক্ত কখনো নয়। সুতরাং কারো কাছে কিঞ্চিৎমাত্রও পাওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়। কোনো আশা নেই, ভরসা নেই, বল নেই, কারো সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। এমনি করে কেবল অনন্যভাবে ভগবানের শরণাগত হতে হবে এবং শরণাগত হয়ে তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে হবে।

'মা শুচঃ' কথাটার অর্থ হল কোনো কিছু সম্বন্ধে চিন্তা না করা। কোনো ব্যাপারে কোনোরকম চিন্তা উদয় হলেই বলতে হবে যে না ! আমি চিন্তা করব না। তাহলে চিন্তা মিটে যাবে। দৃঢ়তা বজায় রাখতে পারলে চিন্তা হলেও তা টিকে থাকবে না। চিন্তা ততক্ষণ পর্যন্ত বজায় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজের মধ্যে কোনো ধরনের সামর্থ্যের অভিমান পোষণ করেন। চিন্তা হওয়ার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার নিহিত আছে। যেমন, যদি চিন্তা হয় যে আমার অভাব আছে, তার অর্থ এই হল যে আমি ধন উপার্জন করতে পারি এবং গ্রহণ করতেও পারি। সুতরাং আমি ধন উপার্জন করতে পারি—প্রকৃত অর্থে এটা আমার সামর্থ্যের উপর ভরসা এবং অহংকার প্রকাশ। শরণাগতের তো ধনের অভাবের অনুভব হলেও কিন্তু চিন্তা কখনো হয় না। এমনিভাবে কোনো রোগ হলে তখন কি করব, রোগ দূর হচ্ছে না—এইরকম চিন্তা হয় না। রোগ হলে সেটা তো ভালো লাগে না,কিন্তু রোগ দূর হচ্ছে না—এই রকম চিন্তা হয় না। চিন্তা তখনই হয়, যখন রোগ দূর করার ব্যাপারে নিজের ওপর বিশ্বাস হয়, নিজের সামর্থ্যের প্রতি কোনো রকম ভরসা রাখা হয়। নিজের প্রতি ভরসা একেবারে রাখবে না। নিজের সামর্থ্যের, বিদ্যার, বুদ্ধির, যোগ্যতার, অধিকারের কোন ভরসা কখনো রাখবে না।

'সুনে রী মৈঁনে নির্বল কে বল রাম॥'

শুধুমাত্র ভগবানেরই সামর্থ্য কাজ করছে, আমার নিজস্ব সামর্থ্য একেবারে নেই। সামর্থ্য থাকলে চিন্তা হয়। এটা খুব গভীর কথা, আপনারা মনোযোগ দিন। যদি কখনো চিন্তা হয় তাহলে তার অর্থ এই যে আমি এটা করিনি, সেটা করিনি, এটা করে নেব, এইভাবে করে নেব—এই প্রকারের চিন্তা উদয় হয়। শরণাগত তো হয়েছি কিন্তু ভগবানের দর্শনই হল না, ভগবানের চরণের প্রতি প্রেমই জাগল না, আমার তো সেইরকম অনন্য গাঢ় প্রীতিও হল না—এই সব না হওয়ার অভাববোধ তো পীড়া দেয়, কিন্তু এই সম্বন্ধে কখনো চিন্তা হওয়া উচিত নয়, কারণ এইসব তো আমার হাতের মধ্যে নেই। আমি তো কেবল ভগবানকেই ডাকব। আমি তো কেবলমাত্র ভগবানেরই। এখন তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি প্রেম প্রদান করবেন, ইচ্ছা হলে তখন দর্শন দেবেন, ইচ্ছা হলে তখন অনন্য ভক্ত করে নেবেন। তাঁর যেমন ইচ্ছা ঠিক তেমন করবেন। আমি তো নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেছি। যেমন কুমোর মাটিকে দলন করে, পেষণ করে, তার ইচ্ছামতন মাটিকে পেষণ করে কিছু তৈরি করে, মাটি মাথায় বহন করে আনে অথবা চাকে বসিয়ে ঘোরায়। মাটি কখনো বলে না—তুমি কি তৈরি করছ ? ঘড়া তৈরি করো, কলসী তৈরি করো, অন্যান্য আসবাবপাত্র তৈরি করো—যা ইচ্ছা তৈরি করো। মাটি কখনো নিজের কোনো ইচ্ছা রাখে না। অতএব যদি আমি কখনো অনুভব করি যে আমার প্রেমের মধ্যে কোনোরকম ন্যূনতা আছে, তাহলেও সে সম্বন্ধে কোনো রকম চিন্তা আসতে দেওয়া উচিত নয়। আমার কিসের সম্পর্ক প্রেম, দর্শন এবং ভক্তির সঙ্গে ? আমি তো কেবলমাত্র ভগবানের। এইরকমভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। **ন্যূনতা অনুভব করা দোষের নয়, কিন্তু নূন্যতার চিন্তা করা দোষের।** আমার তো নিজের কোনো সামর্থ্য নেই। আমি তো তাঁর চরণের শরণাগত। এখন আমি তাঁর হয়ে গেছি। এখন তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমাকে জন্ম-মৃত্যুর বিধান দিন। তাঁর যেমন ইচ্ছা হয়, তেমন তিনি করুন। এইভাবে সমস্ত রকমের সংকল্প-বিকল্প ত্যাগ করে কেবল ভগবানের

শরণাগত হয়ে যাও। তুমি কোনোরকম চিন্তা কোরো না।

ভক্ত যত বেশি নিশ্চিন্ত হয় তার ওপর ততটাই ভগবানের বিশেষ কৃপার প্রভাব পড়ে এবং যে পরিমাণে সে স্বয়ং চিন্তা করে, ততটাই সে ওই প্রভাবে বাধার সৃষ্টি করে। তাৎপর্য হল ভগবানের শরণাগত হওয়ার পর ভগবানের দিক থেকে যে কৃপা বর্ষিত হয়, চিন্তা করলে সেই অটুট, অখণ্ড, দুর্লভ, বিচিত্র কৃপার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। ভগবান যখন দেখেন যে সে নিজেই চিন্তা করছে, তখন ভাবেন যে সে তাহলে নিজেই সমস্ত ঠিক করে নেবে। সুতরাং কৃপার স্রোত রুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং যতটা নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, নিঃশোক, নিঃশঙ্ক, সংকল্প-বিকল্প রহিত হতে পারবে, ততটাই শ্রেষ্ঠ শরণাগতি লাভ হবে। অতএব স্বীকার করে নাও যে নিজের ওপর কোনোরকম ভার নেই, নিজের ওপর কোনো রকম বোঝা নেই, নিজের ওপর কোনোরকম দায়িত্ব নেই। আমি তো এখন সর্বদার জন্য ভগবানের হয়ে গেছি। তাঁর সেবাই হলো আমার একমাত্র দায়িত্ব।

যে ভগবানের কাছে কোনো কিছু চায় অর্থাৎ আমার এটা হোক, সেটা হোক সে ভগবানের থেকে আলাদা হয়ে যায়। যেমন, কোনো কোটি টাকার মালিকের ছেলে যদি তার পিতাকে বলে যে আমাকে এই এই সম্পত্তি দাও, তার অর্থ হল যে সে পিতার থেকে আলাদা হতে চায়। বাস্তবিকপক্ষে কোটিপতির সবকিছুই তো তার। সুতরাং, এই কথাটা দৃঢ়ভাবে মানতে হবে যে আমার কোন চাহিদা নেই। নেওয়ার ইচ্ছা হওয়া মানে ভগবানের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া, ভগবানের প্রেরিত কৃপায় বাধা সৃষ্টি করা। যেমন বিড়ালের শাবক, তার খেয়ালই থাকে না যে কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে। সে তো কেবল তার মায়ের ওপর নির্ভর করে থাকে। যখন তার মা এসে তাকে ধরে নেয়, তখন সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, কোনো রকম প্রতিরোধ প্রদর্শন করে না। এখন তার মায়ের যেখানে ইচ্ছা সেখানে রেখে দেয়, যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যায়, সবই তার মায়ের ইচ্ছা। ঠিক এইরকম দৃষ্টি নিয়ে ভগবানের ভক্ত তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। তাঁর বিধানে সে সর্বদা প্রসন্ন থাকে। সে সুখ-দুঃখ, সম্পত্তি-

বিপত্তি, সংযোগ-বিয়োগ, আদর-নিরাদর, প্রশংসা-নিন্দা কোনো কিছুর দ্বারাই বিচলিত হয় না। তার নিজস্ব কোনো চিন্তা নেই, এবং কখনো কোনো সংশয় জাগলে সে ভগবানকে বলে, 'হে নাথ! আমি কি করব ?' এইপ্রকার চিন্তা ত্যাগ করে সে ভগবানের শরণাগত হয়ে যায়।

প্রশ্ন—শরণাগত ভক্তের জীবন কেমন হয় ?

উত্তর— গীতার অনুশাসন অনুযায়ী কর্তব্য-কর্মের ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ কর্ম ভগবানকে অর্পণ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। যখন সমস্ত কর্ম ভগবানকে সমর্পণ করে ভগবানেরই শরণাগত হতে হবে, তখন নিজের জন্য ধর্ম নির্ণয় করার কোনো প্রয়োজনই নেই।

আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার—এই ধরনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কাছে কোনও যোগ্যতা, পাত্রভেদ, অধিকারের তুলনা হয় না। এই হল সমস্ত সাধনার সারবস্তু। সুতরাং শরণাগত ভক্তের উচিত নিজস্ব মনোবৃত্তি আদির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধুমাত্র ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তার (আপনত্বের) দিকেই লক্ষ্য রাখা।

ভগবান বলছেন—আমার শরণাগত হয়েও যদি তুমি চিন্তা করতে থাকো, তাহলে এটি আমার প্রতি অপরাধ, শরণাগতিতে কলঙ্ক এবং তোমার অহংকার। আমার শরণাগত হয়ে আমার ওপর বিশ্বাস অথবা ভরসা না রাখা—এটা আমার প্রতি অপরাধ এবং নিজের দোষের চিন্তা করা এবং তা দূর করার মধ্যে নিজের সামর্থ্যের কৃতিত্ব আছে বলে মনে করা— এটা তোমার অহংকার। এইসব তুমি ত্যাগ করো। যদিও তোমার আচরণ, মনোবৃত্তি, ভাব এখনো শুদ্ধ হয়নি, দুর্ভাব উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং কখনো-কখনো দুষ্কর্মও হয়ে যায়, তবুও তুমি এইসবের কোনো চিন্তা করো না। এই সব দোষের চিন্তা আমিই করব।

ভগবান যা কিছু বিধান করেন, সেটা সংসারের সমস্ত প্রাণীর কল্যাণের জন্যই করেন। সুতরাং শরণাগত ভক্তের যদি এই দিকে দৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে তখন তার নিজের জন্য কোনো কিছু করা আর বাকী থাকে না।

যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে প্রভুর শরণাগতিকে একবার স্বীকার করে নেয়, তার এই শরণাগত ভাব ক্রমশঃ স্বতঃই দৃঢ় হতে থাকে।

ভগবান তাঁর প্রতি ভক্তের আত্মীয়তার (আপনত্ব) দিকেই দৃষ্টি দেন, ভক্তের দোষ-গুণ দেখেন না অর্থাৎ ভগবান কখনো ভক্তের কোনো দোষ দেখতে পান না।

শরণাগত ভক্ত 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার' এই ভাব যখন দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করে নেয় তখন তার চিন্তা, ভয়, শোক, শংকা প্রভৃতি দোষের আবরণ কেটে যায়। অর্থাৎ দোষের আধার বজায় থাকে না। কারণ সমস্ত দোষ তো ভগবানের প্রতি বিমুখ হওয়ার জন্যই টিকে থাকে।

ভগবানের শরণাগত হয়ে এমন পরীক্ষা কখনো করা উচিত নয় যে আমি শরণাগত হওয়ার পরও যখন এইসব লক্ষণ (সদ্‌গুণ আদি) আমার মধ্যে নেই, অতএব আমি ভগবানের শরণাগত কেমন করে হলাম ?

এই প্রকার সন্দেহ, পরীক্ষা এবং বিপরীত ভাবনা— এই তিনটি না থাকাই হল ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করা। শরণাগত ভক্তের মধ্যে তো এই তিনটি প্রতিবন্ধকই একেবারে আরম্ভেই নির্মূল হয়ে যায়।

মানুষ যখন ভগবানের শরণাগত হয়ে যায়, তখন সে সমস্ত রকমের প্রাণী, সমস্ত ধরনের বাধা-বিঘ্ন প্রভৃতির থেকে সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে যায়। তাকে কেউই ভয়-ভীত করতে পারে না। তার কোনোরকম ক্ষতিও কেউ করতে পারে না।

কেবল ভগবৎকৃপার দ্বারাই জীবের উদ্ধার হয়ে থাকে। সাধন করাতে সাধক কেবল নিমিত্তমাত্র হয়ে থাকে, কারণ সাধনার সিদ্ধিতে ভগবৎকৃপাই মুখ্য কারণ হয়। এই দৃষ্টিতে দেখলে ভগবানের সঙ্গে যে কোনো ধরনের সম্বন্ধ স্থাপন করে নিলে তা জীবের কল্যাণ সাধন করেই থাকে। যে কখনো কোনো প্রকারেই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন না করে কেবল উদাসীন হয়ে থাকে, সে তো ভগবানের প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

ভগবানের যেসব অনন্ত ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, বিভূতি আছে, তার

দিকে শরণাগত ভক্ত কোনোরকম দৃষ্টিপাত করে না। সে তো কেবল ভগবানের শরণাগত হয়ে যায় এবং তার কেবল একটিমাত্র ভাব থাকে যে আমি কেবল ভগবানের শরণাগত এবং কেবল ভগবানই আমার। শরণাগত ভক্তের দৃষ্টি তো কেবল ভগবানের ওপরই থাকা উচিত, ভগবানের গুণ, প্রভাব ইত্যাদির ওপর নয়।

যে পরিমাণে অন্যের আশ্রয় ত্যাগ করা হয়, সেই পরিমাণে ভগবানের আশ্রয় দৃঢ় হতে থাকে ; এবং যখনই ভগবানের আশ্রয় সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়তা লাভ করে তখনই ভগবৎকৃপার অনুভূতি হয়। যখন কেউ সম্পূর্ণভাবে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই সে ভগবানের পূর্ণ কৃপা লাভ করে।

ভগবান গীতায় (১৮।৫৭) অর্জুনকে বলেছেন যে তুমি মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে মৎপরায়ণ হয়ে যাও এবং সমতা আশ্রয় করে আমাতে চিত্ত নিয়োজিত রাখো। এই শ্লোকটিতে ভগবান চারটি কথা বলেছেন— (১) সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করো (২) স্বয়ংকে আমায় অর্পণ করো (৩) সমতা আশ্রয় করে সংসারের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করো এবং (৪) তুমি আমার সঙ্গে অটল সম্বন্ধ স্থাপন করো। শরণাগত ভক্তের জন্য এই কথাগুলি অবশ্যই প্রযোজ্য।

সাধনকালে জীবন-নির্বাহের সমস্যা হলে অথবা শরীর রোগগ্রস্ত হলে অথবা শত বাধা-বিঘ্ন এলেও ভগবানের কৃপার অবলম্বন থাকার জন্য সাধক কখনো বিচলিত হয় না। সেই বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও সে কেবল ভগবানের বিশেষ কৃপাই দেখতে পায়।

———○———

মনের চঞ্চলতা কী করে দূর হবে ?

মানুষ এই ধারণা করে নিয়েছে যে মনকে বশীভূত করা খুব দরকার। কারণ মন নিবিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কিছু হবে না। মন নিবিষ্ট না হলে রাম-রাম জপ করেও কি লাভ ? মন নিবিষ্ট হয়ে গেলে তবেই কাজ হবে। প্রকৃতপক্ষে মনের নিবিষ্ট হওয়া অথবা না হওয়া বড়ো কথা নয়। মনের মধ্যে সংসারের প্রতি যে অনুরাগ, আসক্তি, প্রিয়ত্ববোধ আছে, সেটাই হল অনর্থের মূল কারণ। মন নিবিষ্ট হয়ে গেলে নানাপ্রকার সিদ্ধির প্রাপ্তি হবে, বিশিষ্টতা লাভ হবে, কিন্তু যতক্ষণ সংসারের প্রতি আসক্তি আছে, ততক্ষণ উদ্ধার হবে না। যখন অন্তর থেকে অনুরাগ এবং আসক্তি নির্মূল হয়ে যাবে, তখন জন্ম-মরণও ঘুচে যাবে। দুঃখ হবেই না ; কারণ অনুরাগ এবং আসক্তিই হল সমস্ত দুঃখের কারণ।

পদার্থ, ভোগ, ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনার প্রতি মনের যে অনুরাগ, আকর্ষণ, প্রিয়ত্ববোধ আছে, প্রকৃতপক্ষে সেটাই হল দোষের। মনের চঞ্চলতা ততটা দোষের নয়। যদিও সেটা দোষের ঠিকই, কিন্তু লোকে কেবল চঞ্চলতাকেই দোষের বলে ধারণা করে নিয়েছে। বাস্তবিক, ক্ষতিকর হল অনুরাগ, আসক্তি এবং প্রিয়ত্ববোধ। সাধকের পক্ষে এই কথাটা জানা খুব প্রয়োজন যে এই প্রিয়ত্ববোধই বাস্তবিক জন্ম-মরণ প্রদান করে থাকে।

গুণের সঙ্গই হল উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হওয়ার কারণ। আসক্তি এবং প্রিয়ত্ববোধের প্রতি তো খেয়ালই হয় না, বরং চঞ্চলতার প্রতি শুধু খেয়াল হয়ে থাকে। অতএব বিশেষভাবে এই কথাটার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাস্তবিকপক্ষে প্রিয়ত্ববোধই হল বন্ধনের কারণ। মনের চঞ্চলতা ততটা কারণ নয়। নিদ্রা এলে চঞ্চলতা মিটে যায়, কিন্তু অনুরাগ থেকে যায়। অনুরাগ (প্রিয়ত্ববোধ) নিদ্রার মধ্যেও বজায় থাকে।

আমার এই ব্যাপারে খুব আশ্চর্য লাগে যে মানুষ অনুরাগকে ত্যাগ

করে না ! আপনার টাকা খুব ভালো লাগে। আপনি মান-সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় দশ-কুড়ি লক্ষ টাকাও খরচ করবেন, কিছু টাকার প্রতি আপনার যে অনুরাগ সেটা, আপনি কিছুতেই ছাড়তে চাইবেন না। টাকার প্রতি আপনার এতই মোহ ! টাকার প্রতি যে অনুরাগ, প্রিয়ত্ববোধ আছে, সেটা ত্যাগ করা খুবই প্রয়োজন। এইদিকে লোকের মনোযোগই নেই, লক্ষ্যও নেই। সুতরাং আপনারা এখন থেকে এদিকে মনোযোগ দিন। অনুরাগের মহত্ত্ব অন্তরের ভিতরে সঞ্চিত থাকে। যারা বহুবছর ধরে সৎসঙ্গ করছেন, ভাবনা-চিন্তা করছেন, এমন ব্যক্তিরাও এই দিকে মনোযোগ দেন না এবং অনুসন্ধান করেন না যে এত অনর্থের কারণ কি ? ব্যবহারে, পরমার্থে, খাওয়া-দাওয়া, লেন-দেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুরাগ হল খুব বড়ো বাধা। এটা দূর হলে আপনার ব্যবহারও তখন খুব সহজ এবং সরল হয়ে যাবে। পরমার্থ এবং ব্যবহারেও উন্নতি হবে।

বিশেষ কথাটি হল যে আসক্তি এবং অনুরাগ হল খারাপ বস্তু। এমন কি সৎসঙ্গের কথাও যদি শোনেন বা স্মরণ করেন, কিন্তু যতক্ষণ অনুরাগ ত্যাগ না করতে পারছেন ততক্ষণ উন্নতি হবে না। আপনি প্রশ্ন করেছেন যে মনের চঞ্চলতা কি করে দূর হবে ? কিন্তু মূল প্রশ্ন এটা হওয়া উচিত যে অনুরাগ এবং প্রিয়ত্ববোধের নাশ কি করে হবে ? ভগবান গীতায় এই অনুরাগের পাঁচটি নিবাস স্থান উল্লেখ করেছেন।

'ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ' (৩।৩৪)

স্বয়ং, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি এবং পদার্থ— এই পাঁচটি স্থানে অনুরাগ বাস করে। গভীরভাবে দেখলে বোঝা যাবে যে এই পাঁচটি স্থানের মধ্যেও 'স্বয়ং'এ (আমীত্বে) যে অনুরাগ আছে, সেটাই অপর চারটিতে স্থিত আছে। যদি 'স্বয়ং'এর (আমীত্ব থেকে) অনুরাগ মিটে যায় তাহলে আপনি ধন্য হয়ে যাবেন। মন চঞ্চল হলেও যদি অনুরাগের পরিবর্তে ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয়ে যায় তাহলে অনুরাগ মিটে যাবে। ভগবানের প্রতি আকর্ষণ হলেই অনুরাগ শেষ হয়ে যাবে।

ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হওয়ার বিশেষ মহিমা আছে। এর মহিমা

জ্ঞান এবং মোক্ষর চেয়েও অধিক বললে কোনোরকম অত্যুক্তি করা হয় না। এই প্রেমের খুবই অলৌকিক মহিমা। এর চেয়ে বড়ো তত্ত্ব আর কিছুই নেই। জ্ঞানের চেয়েও প্রেম বড়। সেই প্রেমের সমান দ্বিতীয় কিছু নেই। ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয়ে গেলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন হল সেই প্রেম কি করে জাগ্রত হয় ? সংসারের প্রতি অনুরাগ দূর হলে ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয়ে যায়। অনুরাগ কি করে দূর হয় ? ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত করতে হলে দুটি কাজ করতে হবে–

(১) অনুরাগ ত্যাগ করা এবং (২) ভগবানের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি করা।

প্রথমে কি করতে হবে ? ভগবানের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন রামায়ণ-পাঠ করার সময় যদি মন দিয়ে এবং অর্থ বুঝে পাঠ করা হয় তাহলে মন খুব শুদ্ধ হবে এবং অনুরাগ (সংসারের প্রতি আসক্তি) দূর হবে। ভগবানের কথা প্রেমপূর্বক শুনলে অন্তরের অনুরাগ স্বতঃই দূর হবে এবং প্রেম জাগ্রত হবে। এর মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের রস পরিপূর্ণ হয়ে আছে। পাঠ করার সাধারণ অভ্যাস হলে মানুষ আকৃষ্ট না হতে পারে, কিন্তু যেখানে রস পাওয়া যায় সেখানে মানুষ আকৃষ্ট হবেই। এর মধ্যে এক বিশেষ ধরনের রস ভরা আছে তা হল 'প্রেম'। আপনি নিজের পাঠ করে দেখুন। তাতে মন নিবিষ্ট করুন। ভক্তদের জীবনী পড়ুন, তাতে বিশেষ লাভ হয়, কারণ সেটা হৃদয়ে প্রবেশ করে। যখন প্রেম প্রবেশ করবে তখন অনুরাগ মিটে যাবে, কামনাও মিটে যাবে। এগুলি মিটে গেলে আপনি ধন্য হয়ে যাবেন। বিচারের দ্বারাও এগুলি মিটে যেতে পারে, কিন্তু বিচারের চেয়েও প্রেম বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। প্রেম কি করে জাগ্রত হবে ?

জো সন্ত, ঈশ্বর ভক্ত জীবন মুক্ত হো গয়ে।
উনকী কথাএঁ গা সদা মন কো শুদ্ধ করনেকে লিয়ে॥

মনের শুদ্ধতার প্রয়োজন অনেক বেশি। মনের চঞ্চলতার চাইতে মনের অশুদ্ধি মেটানোর অনেক বেশি প্রয়োজন। মন শুদ্ধ হয়ে গেলে চঞ্চলতা খুব সহজেই মিটে যাবে। মন নির্মল হয়ে গেলে, তখন যেখানে খুশি মনকে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

কপটতা, ছলনা, মিথ্যাচারণ ভগবান কখনো সহ্য করেন না। কিন্তু এই সমস্ত করতে আপনি তো কখনো ভয়ই পান না। মিথ্যা বলা, কপটতা করা, ধোঁকা দেওয়া—এই সব করায় তো আপনার কখনো অনুশোচনাও হয় না। আপনি তো জেনে বুঝেই এই সব করে থাকেন। তাহলে মন কি করে নিবিষ্ট হবে ? আপনি তো নিজেই নিজের দিক থেকে রোগ বৃদ্ধি করে যাচ্ছেন। এই সবের প্রতি যতখানি আসক্তি, প্রিয়ত্ববোধ আছে, তা খুব ক্ষতিকারক। এটা আপনি বিচার করে দেখুন। আসক্তি খুব গভীরে প্রবেশ করে বাসা তৈরি করেছে। নিজের ভিতরে পদার্থের গুরুত্ব অত্যধিক মাত্রায় বিরাজমান। এটা মস্ত বড় বাধা। এটা দূর করার জন্য সৎসঙ্গ এবং সৎ শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা উচিত, যার ফলে খুব আশ্চর্যজনক লাভ হয়।

মন কী করে স্থির হবে ? মনকে স্থির করার জন্য খুব সরল উপায় জানাচ্ছি। আপনি মনে মনে ভগবানের নাম জপ করুন এবং মনে মনেই জপের সংখ্যা গণনা করুন। রাম-রাম-রাম— এইভাবে রামের নাম জপ করুন। এক রাম, দুই রাম, তিন রাম, চার রাম, পাঁচ রাম। মুখে এক-দুই-তিন বলবেন না, আঙুলে অথবা মালায়ও জপের সংখ্যা গুনবেন না। শুধু মনে মনেই নাম করবেন এবং মনে মনেই সংখ্যা গুনবেন। এটা করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে মন নিবিষ্ট না হলে এটা কিছুতেই হবে না এবং যদি হয় তাহলে মন নিবিষ্ট হয়েই যাবে।

খুব সহজ উপায় হল— মনে মনেই নাম করুন, মনে-মনেই গণনা করুন এবং তারপর মানস-চক্ষু দিয়ে উজ্জ্বল বর্ণ দ্বারা লিখিত 'রাম' শব্দটা দেখুন। এইরকম অভ্যাস করতে পারলে মন কোথাও যাবে না এবং গেলে এরূপ করতেও পারবেন না। এটা অত্যন্ত খাঁটি কথা। আপনারা নিজেরাই একবার পরখ করে দেখুন। খুব সহজেই মন নিবিষ্ট হবে। কিন্তু যদি কঠিন বলে মনে হয়, তাহলে এই ক্রম কিছুতেই বজায় রাখা যাবে না। তখন একই সঙ্গে নাম করতে পারবেন না, গণনা করতে পারবেন না, দেখতেও পারবেন না। এইজন্য মনের চোখ দিয়ে দেখুন, মনের কান দিয়ে শুনুন, মনের জিহ্বা দিয়ে কথা বলুন। এমন করলে মন স্থির হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় উপায় হল জিহ্বা দ্বারা আপনি একটা নাম করুন এবং মনে মনে আরেকটা নাম করুন। যেমন মুখে নাম জপ করুন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এইরকম করতে থাকুন আর ভিতরে রাম-রাম-রাম— উচ্চারণ করে মনকে নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করুন। দেখুন মন নিবিষ্ট হয় কিনা ! এটা সম্ভব হয় বলেই তো আপনাদের জানাচ্ছি। এটা কঠিন বলে মনে হয় এইজন্য যে মন আপনার আয়ত্তের মধ্যে নেই। মন নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করুন, এর দ্বারা মন সহজেই নিবিষ্ট হয়ে যাবে।

তৃতীয় উপায় জানাচ্ছি। যদি মনকে নিবিষ্ট করতে চান তাহলে মনে মনে কীর্তন করুন। মনে-মনেই সুর দিয়ে গান করুন। এর দ্বারা মন নিবিষ্ট হয়ে যাবে। মুখে নাম করবেন না। কণ্ঠ দ্বারা কীর্তন করবেন না। মনে-মনেই কীর্তন করুন এবং মনে-মনেই সুর দিয়ে ভগবানের নাম জপ করুন।

প্রথমেই অনুরাগ (আসক্তি) মেটানো খুবই প্রয়োজন এবং সেবা করলে অনুরাগ সহজেই মিটে যায়। উৎপন্ন এবং বিনাশশীল বস্তুর দ্বারা যে কোনো উপায়ে সেবা করতে হবে—এইরকম মনোভাব রাখতে হবে। পারমার্থিক মার্গের, অবিনাশী তত্ত্বের, ভগবানের কথার প্রতি যদি একবার কোনোপ্রকারে অনুরাগ জাগ্রত হয়ে যায়, তাহলে প্রেম উৎপন্ন হবে। ভগবান এবং তাঁর নাম, গুণ, লীলার প্রতি আসক্তি হয়ে গেলে খুব বড় ধরনের লাভ হবে। নিজের স্বার্থ এবং অভিমান ত্যাগ করে সেবা করলেও অনুরাগ মিটে যাবে।

———o———

ভগবানের প্রতি মন কী করে নিবিষ্ট হবে ?

আপনি যে ধরনের সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে স্বীকার করে নেবেন, ভগবানও সেই ধরনের সম্বন্ধ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত। সরল হৃদয়ে আপনার যেমন ভাব হবে, তেমন ভাব অন্তরে অবলম্বন করুন।

তূ দয়ালু, দীন হৌঁ, তূ দানি, হৌঁ ভিখারী।
হৌঁ প্রসিদ্ধ পাতকী, তু পাপ-পুঞ্জ-হারী॥
নাথ তূ অনাথ কো, অনাথ কৌন মোসো।
মো সমান আরত নঁহী, আরতিহর তোসো॥

ঠিক একইভাবে তুলসীদাসজী বলেছেন—

তোহিঁ মোহিঁ নাতে অনেক, মানিয়ে জো ভাবৈ।
জ্যোঁ-ত্যোঁ তুলসী কৃপালু ! চরন-সরন পাবৈ॥

এইরকমভাবে স্বীকার করে নিন। ভগবানের প্রতি ভাব পরিবর্তন করে নিন। ভগবানকে ভগবানই বলে স্বীকার করে নিন অথবা নিজের প্রিয়তম বলে স্বীকার করে নিন, যেমন রূপ আপনার ভালো লাগে তাঁকে তেমন রূপে স্বীকার করে নিন। এখানে বেশ কিছু বছর আগে একবার আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন আমার তো মায়ের নাম ভালো লাগে। প্রত্যেকেরই তো মাকে ভালো লাগে। মা'ই আমাদের পালন করে থাকেন এবং বুড়ো হয়ে গেলেও আমাদের মাকেই মনে পড়ে। মায়ের যে স্নেহ, তার প্রভাব খুব বেশি হয়ে থাকে। তাই, আমাকে এক সজ্জন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমরা কি ভগবানকে মা বলে ডাকতে পারি ?

ভগবানের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ একেবারেই নেই। মা বলে ডাকলে ভগবান মায়ের রূপ ধরে চলে আসবেন। প্রবোধ-সুধাকর পুস্তকে শ্রীশংকরাচার্যজী মহারাজ (বেদান্তের আচার্য) **'মাতঃ কৃষ্ণাহভিধানা'**

লিখেছেন। তিনিও ভগবান কৃষ্ণকে মা বলে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং ভগবানকে মা বলে ডাকুন। মা নামের সাথে সাথে যদি ভক্তি এবং স্নেহ জাগ্রত হয়, মন নিবিষ্ট হয় তাহলে ভগবানকে মা বলুন, আবার যদি পিতা হিসেবে কল্পনা করলে মনের মধ্যে একাগ্র ভক্তির সঞ্চার হয় তবে পিতা বলুন, একই ভাবে মন চাইলে ভাই বলুন। যে নাম ভালো লাগে, যে সম্বন্ধ ভালো লাগে তাই অবলম্বন করুন। এইরকমও যদি স্বীকার করা সম্ভব না হয়, তাহলে রাধারাণীকে মা বলে স্বীকার করুন, অথবা কৃষ্ণ আমার 'মা', এইরকম সম্বন্ধ স্বীকার করুন।

প্রথমদিকে, সম্বন্ধ স্থাপন করার সময় মন নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং একটাই উদ্দেশ্য, একটিমাত্র লক্ষ্য আরম্ভেই স্থির করে নিতে হবে। তাহলে মন এদিক-সেদিক যাবে না। একটি স্থানেই নিবিষ্ট হয়ে থাকবে। যেমন আপনারা ছেলে অথবা মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করে থাকেন। যখন আপনি ছেলের সম্বন্ধ করেন এবং অনেক মেয়ের কথা আলোচনা করেন, তখন ছেলে সেসব কথা শোনে। যখন মেয়ের সম্বন্ধ করেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন যে দেখো সেখানে এইরকম ছেলে আছে, এত লেখা-পড়া জানা। এই ধরনের আলোচনা যখন হয় তখন তা মেয়ে শোনে। এই ধরনের কথা-বার্তা মেয়ে কতদিন পর্যন্ত শোনে ? যতদিন পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধ পাকা না হয়। একবার যখন অমুকের সঙ্গে পাকা কথা হওয়ার পর সম্বন্ধ পাকা হয়ে যায়, তারপর কিন্তু মেয়ে কেবল সেই ছেলের কথাই শুনতে চায়। অন্যদের কথা আর এইভাবে শুনতে চায় না। শুনলেও গ্রাহ্য করে না। ঠিক এমনিভাবে যদি ছেলেরও কারো সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা হয়ে যায় তাহলে ছেলে সেই সম্বন্ধ করা মেয়েটিরই কথা শুনতে চায়। তার কেমন যোগ্যতা ? কেমন চলন-বলন ? মেয়েটিও লুকিয়ে লুকিয়ে শোনে। এমন কেন হয় ? সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে না এখন ! সম্বন্ধ পাকা না হলে তার এইরকম শোনার আগ্রহই হত না। কত কথা-বার্তা তো হয়ে থাকে, কিন্তু সে এইসব গ্রাহ্যই করে না। আমরাও ভগবানের কথা শুনি না, কারণ তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়নি। যখন একবার তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ

স্থাপন করে নেব, তখন কেবল তাঁরই কথা শুনব। তারপর আর নানা ধরনের কথা কে শুনবে ? বলুন ! শুনলেও কোনো প্রভাব পড়বে না। ঠিক সেইভাবে আমরাও অন্য কোনো কথা শুনব না, যেভাবে সেই মেয়ে অন্য ছেলেদের কথা শোনে না। কেবল সম্বন্ধ করা ছেলেটির কথাই শোনে, যাকে আগে কখনো দেখেনি, যার কথা শোনেনি। কেবল মা-বাবা সম্বন্ধ করেছেন যে আমরা অমুকের সঙ্গে বিয়ে দেব। একইরকম ভাবে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। যদি আমরা ভগবৎপ্রাপ্তি করতে চাই তাহলে ভগবানের কথা আমাদের স্বতঃই, স্বাভাবিকই ভালো লাগবে। তখন মন অন্য কোথাও কেন যাবে ? কোথায় যাবে ? আমাদের তো অন্য কারোর সঙ্গে কোনোরকম সম্বন্ধই নেই, ভাই !

হমেঁ ক্যা কাম দুনিয়াসে হমেঁ শ্রীকৃষ্ণ প্যারে হৈঁ।
যশোদা নন্দকে নন্দন মেরে আঁখোঁকে তারে হৈ॥

অন্যদের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক ? জগতের সঙ্গে কিসের লেন-দেন ? কিছু নেওয়ার নেই, কিছু দেওয়ার নেই। আমার তো একমাত্র ভগবানই আছেন এবং তিনিই কেবল আমার।

ভগবানের গুণ, তাঁর চরিত্র, তাঁর মহিমা শ্রবণ করা উচিত। যেখানে ভগবানের কথা পাঠ করা হয়, তা শুনলে ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয়। ভক্তদের জীবনী পড়লেও আত্মার উন্নতি হয়। সেটাও একটি উৎকৃষ্ট উপায়। প্রতিদিন একঘণ্টা, দুইঘণ্টা আপনি কোনো জায়গায় একান্তে গিয়ে বসুন অথবা নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসুন। ভক্তদের জীবনী পড়ুন। যখন পড়তে পড়তে গদ্‌গদ্ হয়ে যাবেন এবং প্রিয়ত্ব বোধ জাগবে, সেই সময় বই পড়া বন্ধ করে দিন। তখন নাম-জপ অথবা কীর্তন শুরু করে দিন। ভগবানের চিন্তা এবং ভজন শুরু করে দিন। যখনই মন আবার এখানে-ওখানে যাবে এবং আগের সেই ভাবের রেশ কেটে যাবে, তখন আবার বইয়ের পড়া জায়গাটির একটু আগে থেকে আবার পড়তে শুরু করুন। তারপর পড়তে পড়তে যেই ভাব এসে যাবে, তখনই আবার সেখানে পড়া বন্ধ করে দিন। বইটা পড়তে হবে এবং শেষ করতে হবে, এটা কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য

কেবল মনকে ভগবানে নিবিষ্ট করা। এইভাবে মনকে নিবিষ্ট করুন। তারপর, আবার নাম-জপ শুরু করুন, কীর্তন শুরু করুন, প্রার্থনা শুরু করুন। মনে মনে ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন করুন। আমার মন কিছুতেই নিবিষ্ট হয় না মহারাজ ! আমি কি করব ? আপনি কবে দর্শন দেবেন ? আপনার চরণে কবে প্রেম উৎপন্ন হবে ? একটি বই প্রকাশিত হয়েছে গীতাপ্রেস থেকে **'ধ্যানাবস্থায় প্রভুর সঙ্গে বার্তালাপ'**। সেই বইটির নির্দেশ মতন আচরণ করুন, খুব লাভ হবে। চলতে-ফিরতে ভগবানের সঙ্গে কথা শুরু করে দিন। মনে-মনে প্রশ্ন করলে মনে-মনেই উত্তর পাবেন। কোনোরকম চিন্তা এলেই ভগবানকে জিজ্ঞেস করুন—খুব সহজেই মন নিবিষ্ট হয়ে যাবে। এইভাবে বিনয়পত্রিকা অথবা কোনো স্তুতি পাঠ করুন। স্তুতি পাঠ করতে করতে মন নিবিষ্ট হলে তখন চিন্তন করা, নাম-জপ করা শুরু করে দিন। যখন এর রেশ কেটে যাবে তখন আবার পড়া শুরু করে দিন। এই কথাগুলির মধ্যে যে কোনো একটিকে আপনি অনুসরণ করে দেখুন। বাস্তবিকপক্ষে কথাগুলি সত্যই যুক্তিসঙ্গত। এখন এটা আদৌ হওয়া সম্ভব কি না, তা আপনি নিজে একবার অনুসরণ করে দেখুন। নিজে অনুসরণ করলে তখন জানতে পারবেন যে কোথায় কোথায় বিঘ্ন আসছে, কোথায় বাধা আসছে, কেন বাধা আসছে। এই সব আপনি নিজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

যদি মন বেশি চঞ্চল হয়ে পড়ে, তাহলে জপ করতে থাকুন, অল্প কিছুক্ষণ পর পর ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলুন যে আপনার চরণে মন নিবিষ্ট হতে পারছে না। হে ভগবান ! মন নিবিষ্ট হচ্ছে না। বারবার মনে মনে নমস্কার করুন এবং এইভাবে বলতে থাকুন। এটা খুব সরল উপায়। নাম-জপ করতে থাকুন, আধ মিনিট বা এক মিনিট হয়ে গেলে আবার বলুন—মহারাজ ! মন নিবিষ্ট হচ্ছে না। এইভাবে বলাও একপ্রকারের প্রার্থনা। ভগবানের স্মরণ হয়ে গেল। অন্যদিকে নাম-জপও হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ-সাত দফা মালা জপ করার পর বলুন—মহারাজ, মন নিবিষ্ট হচ্ছে না। হে নাথ ! আমি ভুলে যাচ্ছি। হে নাথ ! মন নিবিষ্ট হচ্ছে না। বারবার নমস্কার

করতে থাকুন এবং বলতে থাকুন। ভগবান ব্রহ্মা নির্দেশিত ষোড়শ মন্ত্র জপ করুন এবং প্রার্থনা করতে থাকুন— হে নাথ ! মন নিবিষ্ট হচ্ছে না। হে ভগবান, কি করব ? মহারাজ ! আপনার চরণে মন নিবিষ্ট হচ্ছে না। এইভাবে বলতে থাকুন। তখন তাঁর কৃপায় মন নিবিষ্ট হতে শুরু করবে।

———o———

নিরন্তর ভগবৎস্মৃতি কেমন করে হবে ?

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বলেছেন—

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। (৮।৭)

সুতরাং, তুমি সব সময় নিরন্তর আমাকেই স্মরণ করো এবং যুদ্ধ (কর্তব্য কর্ম)ও করো। ভগবানকে স্মরণ সব সময় করা যায়, কিন্তু যুদ্ধ তো সব সময় করা যায় না। সাধারণ লোকেদের যেমন নিজেদের ঘরে কাজ-কর্ম থাকে, অর্জুনের সামনেও ঠিক তেমনই তখন যুদ্ধরূপী কর্তব্য-কর্ম ছিল। যুদ্ধের মতন ঘরের কর্তব্য কর্মও সব সময় করা যায় না। এইভাবে ভগবানকে স্মরণ করতে করতে কর্ম করা, কর্ম করতে করতে ভগবানকে স্মরণ করা এবং ভগবানেরই কর্ম করা—এই তিনটি বিকল্পের মধ্যে প্রথমটিতে ভগবৎস্মরণই হল মুখ্য এবং কার্য গৌণ। দ্বিতীয়টিতে কার্যই হল মুখ্য এবং ভগবৎস্মরণ গৌণ এবং তৃতীয়টিতে ভগবানের প্রতি অনন্যভাব হল মুখ্য।

প্রায়ই লোকে কাজ করার সময় ভগবানকে ভুলে যায়। এর জন্য স্বয়ং এর (নিজের) অসাবধানতা তো প্রধানভাবে দায়ী, কিন্তু তার সঙ্গে আরেকটি মারাত্মক ভুলও করা হয়। একটি সিদ্ধান্তের কথা হল যার প্রতি মমতা হয়, তার স্বতঃই স্মরণ হতে থাকে। যেহেতু লোকে কাজ-কর্মকে নিজের বলে মনে করে এবং কাজ-কর্মের প্রতি মমতা বজায় রাখে, সেহেতু কাজ-কর্মই তাদের স্মরণে আসে, ভগবান নয়। যদিও বা ভগবান স্মরণে আসেন, তাহলেও কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে আবার ভুলে যায়। অতএব এটা দৃঢ়ভাবে নিশ্চয় করে নেওয়া উচিত যে আমাকে ঘরের কাজ করতেই হবে না, কেবল ভগবানেরই কাজ করতে হবে। **'অঞ্জন কহা আঁখ জেহিঁ ফূটে'** যে অঞ্জন দিলে চোখ ফুটে যায়, সেই অঞ্জন কেমন ? তার সাথে আমার কী সম্পর্ক ? ঘরের কাজ করার সময় যদি ভগবানকে ভুলে যেতে হয় তাহলে এমন কাজের কী প্রয়োজন ? অতএব সাধকের উচিত

এটা মেনে নেওয়া যে ঘর আমার নয়, কাজ আমার নয় এবং আমি (স্বয়ং)ও আমার নয়। ঘর, কাজ এবং আমিও হলাম শুধুমাত্র ভগবানের। ভগবানের দেওয়া শক্তির দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতার জন্য আমি ভগবানেরই কাজ করছি—এই রকম দৃঢ় ভাবনা হলে তখন ভগবানের প্রতি মমত্ব বোধ উৎপন্ন হবে এবং তার ফলে ভগবানের স্মরণ স্বতঃই হতে থাকবে। তখন স্মরণ করার জন্য কোনোরকম চেষ্টার প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ঘর প্রভৃতিকে নিজের বলে মনে করবে, ততক্ষণ স্মরণ করতে ভুল হবেই। যেমন, আমরা যখন কোনো ধর্মশালাতে গিয়ে থাকি, তখন এই কথাটা সবসময় মনে রাখি যে এই ধর্মশালা আমাদের নিজস্ব নয়। এইরকমভাবে ঘরে বাস করার সময়ও এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে এই ঘর আমাদের নিজস্ব নয়, এখানে তো খুব অল্প সময়ের জন্য আমরা থাকতে এসেছি। এই কথাটা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে যে এই ঘর আমার নয়, ধন সম্পত্তি আমার নয়, পরিবার আমার নয়, শরীর আমার নয়। এইসব তো অল্প সময়ের জন্য লাভ করা হয়েছে। সময় শেষ হয়ে গেলেই এইসব থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। যদি এরা সত্যিই আমার হত, তাহলে সর্বদা আমার সঙ্গেই থাকত ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের ওপর আমার কোনোরকম অধিকারই খাটে না, আমার ইচ্ছামতন এদের পরিবর্তনও করা যায় না এবং এদের ক্ষয় বা বিনাশও রোধ করা যায় না। তাহলে এইসব পদার্থ ইত্যাদি আমার কি করে হল ? কোনো প্রকারের যুক্তি দিয়েই এটা কখনো প্রতিপন্ন করা যায় না যে এইসব পদার্থ প্রভৃতি 'আমার'। সুতরাং, এরা কখনোই আমার নয়, এবং কখনোই আমার হতে পারে না।

আমার তো একমাত্র ভগবানই আছেন ; কারণ ভগবান আগেও আমার ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরেও থাকবেন। সাংসারিক পদার্থগুলি আগেও আমার ছিল না, পরেও আমার হবে না এবং বর্তমানেও এদের থেকে নিরন্তরই বিয়োগ হয়ে যাচ্ছে। সংসারের সঙ্গে কখনো সংযোগ হয়নি এবং ভগবানের সঙ্গে কখনো বিয়োগ হয়নি।

ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা কখনো মেটে না। মানুষ এই কথাটা স্বীকার করুক

অথবা না করুক ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার হৃদয়ে এই কামনা অবশ্যই থাকে যে আমি চিরদিনের জন্য যেন পরিপূর্ণভাবে সুখী হয়ে যাই। সমস্ত বন্ধনের থেকে যেন মুক্ত হই, আমার কাছে কখনো দুঃখ যেন না আসে। এটাই হল ভগবৎ প্রাপ্তির ইচ্ছা। এই ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হয়, কারণ এটাই হল বাস্তবিক এবং প্রকৃত ইচ্ছা।

সংসারের ইচ্ছা একেবারে মেকী। এই ইচ্ছা উৎপন্ন এবং নাশ হতে থাকে, কিন্তু কখনো পূর্ণ হয় না। লোকে মিথ্যে ধারণা করে রেখেছে যে সংসারের ইচ্ছা মেটে না, কিন্তু প্রকৃত কথা হল এই যে সংসারের ইচ্ছা টেকে না, পরিবর্তিত হতে থাকে। কৈশোরে অন্য ধরনের ইচ্ছা ছিল, যৌবনে অন্য ধরনের ইচ্ছা হয় এবং বৃদ্ধাবস্থায় ইচ্ছার রূপ পরিবর্তিত হয়। সংসার স্বয়ং পরিবর্তনশীল। সুতরাং সংসারের ইচ্ছাও পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে। শরীরও পরিবর্তনশীল। অতএব যে সংসারের ইচ্ছা, তা হল প্রকৃতপক্ষে শরীরের ; ব্যক্তিবিশেষের স্বয়ং এর ইচ্ছা নয়। স্বয়ং (জীব) অপরিবর্তনশীল, পরমাত্মাও অপরিবর্তনশীল এবং পরমাত্মা লাভের ইচ্ছাও অপরিবর্তনশীল। সেইজন্য পরমাত্মা-প্রাপ্তির ইচ্ছাই হল স্বয়ং এর ইচ্ছা। সাংসারিক বস্তু প্রভৃতি তো শরীরই প্রাপ্ত করে থাকে অর্থাৎ দেহ পর্যন্ত পৌঁছায়, স্বয়ং-এ কখনো নয়। স্বয়ং তো পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত করতে পারে ; কারণ সংসার, সাংসারিক পদার্থ এবং শরীরের মধ্যে জাতিগত ঐক্য আছে। এই প্রকারে পরমাত্মা এবং স্বয়ং (জীব) এর মধ্যে জাতিগত ঐক্য আছে। স্বাভাবিক সম্বন্ধ তো স্বজাতীয়র মধ্যেই হয়ে থাকে, বিজাতীয়র মধ্যে কখনো নয়। সংসারের অংশের তো সংসারের প্রতি ইচ্ছা আছে এবং পরমাত্মার অংশের তো পরমাত্মার প্রতি ইচ্ছা আছে।

সংসারের কাজ এবং ঘর-পরিবারের কাজ— সবই হল শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদির কাজ, আমাদের (স্বয়ং-এর) কাজ নয়। আমাদের কাজ হল কেবল ভগবানের ভজন করা এবং ভগবান ও তাঁর তত্ত্বকে লাভ করা। আমাদের একমাত্র ভগবানেরই আবশ্যকতা আছে এবং ভগবৎ লাভের ইচ্ছাই হল আমাদের বাস্তবিক ইচ্ছা। সংসারের কাজ তো আমাদের নিজস্ব কাজ নয়।

উপরোক্ত প্রকরণানুসারে এটাই সিদ্ধ হয় যে জীবের সঙ্গে কেবল পরমাত্মারই স্বতঃসিদ্ধ নিত্য সম্বন্ধ আছে। কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ সংসার এবং সংসারের কর্মকে নিজের বলে মেনে নেওয়ার জন্যই জীব কর্ম করার সময়ে ভগবানকে ভুলে যায়। যদি জীব দৃঢ়তাপূর্বক ভগবানের সঙ্গে নিজের নিত্য, সত্য, শাশ্বত সম্বন্ধ স্বীকার করে নিয়ে কেবল তাঁকেই নিজের বলে মেনে নেয় এবং ভগবৎপ্রাপ্তির অতিরিক্ত অন্য কোনো কাজকেই নিজের কাজ বলে মনে না করে, তাহলে সে ভগবানকে কখনো ভুলে যেতে পারে না। সংসারের ইচ্ছা করা এবং সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ মেনে নেওয়ার জন্যই ঈশ্বর লাভের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। সুতরাং নিজের বাস্তবিক সম্বন্ধ এবং প্রকৃত কাজকে সঠিক ভাবে জানা উচিত।

প্রশ্ন—নিরন্তর ভগবৎস্মরণের জন্য নাম-জপের কি কোনো প্রয়োজন আছে ?

উত্তর—কলিযুগে নামই হল সর্বোপরি সাধন। নাম-জপের দ্বারা সমস্ত কাজ স্বতঃই ভালোভাবে হয়ে যায়। '**নামু রাম কো কল্পতরু কলি কল্যান নিবাসু**।।' (শ্রীরামচরিতমানস ১।২৬)। ভগবান শ্রীরামের নাম-রূপী কল্পতরু কলিযুগে শীঘ্র কল্যাণ সাধন করে। কল্পতরুর কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। নিরন্তর নাম-জপ করলে এর মধ্যে এক ধরনের অপূর্ব রসের অনুভূতি পাওয়া যায়। যেমন, কেউ যদি মিষ্টি খায়, তবেই সে মিষ্টির আস্বাদ পায়। তেমনিভাবে যে ভগবানের নাম জপ করে, কেবল সেই এই নামের রস আস্বাদন করতে পারে।

নাম-জপের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়। নাম-জপের দ্বারা বিষয়-বাসনা দূর হয়, পাপ নষ্ট হয় ; বিকার দূর হয় ; শান্তি লাভ হয় এবং ভক্তি বৃদ্ধি হয়। নাম-জপের মাধ্যমে অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে। যখন মনে চিন্তা আসবে, তখন আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা নাম জপ করুন, চিন্তা মিটে যাবে। যে সজ্জন ব্যক্তি নাম-জপ করেন তিনি নামময় হয়ে যান।

নাম-জপই হল প্রকৃত ধন যা আপনার সঙ্গে যাবে। এইজন্য বলা হয়েছে—'**ধনবন্তা সোই জানিয়ে জাকে রাম নাম ধন হোয়।**' নামের প্রকৃত মূল্য কেউ নির্ণয় করতে পারে না। এটি এক অমূল্য রত্ন। '**পায়ো রী মৈঁনে**

রাম রতন ধন পায়ো।' নামকে তো সগুণ এবং নির্গুণ—উভয়ের থেকেও শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

কহৌঁ কহাঁ লগি নাম বড়াঈ। রামু ন সকহিঁ নাম গুন গাঈ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।২৫।৪)

স্বয়ং ভগবানও চাইলে নামের সম্পূর্ণ গুণ গাইতে পারবেন না। নামের মহিমা এমন অপার, অসীম এবং অনন্ত।

প্রশ্ন—নাম-জপের প্রকৃত নিয়ম কী ?

উত্তর— ভগবানের স্বরূপ ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে, অর্থ হৃদয়াঙ্গম করে, ভগবানের সঙ্গে আপনভাব স্থাপন করে নাম জপ করতে হবে। নাম-জপ গুপ্তরূপে এবং নিষ্কামভাবে করতে হবে। নাম-জপ নিরন্তর করতে হবে। মনে-মনে ভগবানকে প্রণাম করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন— হে নাথ ! আমি আপনাকে ভুলব না, হে প্রভু ! আপনাকে আমি ভুলব না। এমনভাবে কিছুক্ষণ পরে পরেই বারবার বলতে থাকুন।

আরেকটি কথার প্রতি মনোযোগ দিন। যদি কখনো আপনার ভগবানকে হঠাৎ স্মরণ হয় অথবা ভগবানের নাম আপনার হঠাৎ মনে পড়ে যায়, তখন বুঝে নিতে হবে যে সেই সময় ভগবান আপনাকে স্মরণ করেছেন। এইরকমভাবে অনুধাবন করে প্রসন্ন হয়ে যান যে আমি ধন্য হয়ে গেলাম ; আমাকে ভগবান স্মরণ করেছেন। তখন অন্য সমস্ত কাজ ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রেখে দিয়ে, সেই সময় কেবল নাম-জপ এবং কীর্তনে নিজেকে নিয়োগ করুন। এমন করতে পারলে ভক্তির অত্যধিক বৃদ্ধি হবে।

মালায় জপ করলে লাভদায়ক হয়। ভগবানকে স্মরণ করার জন্য মালা হল একটি উপকরণ বিশেষ। মালা ঘুরিয়ে জপ করতে হয়। নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ সম্পন্ন করা যায়। জপের নির্দিষ্ট সংখ্যা যাতে কমে না যায় সেইজন্য মালার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বিনা মালায় যদি নিরন্তর জপ করা সম্ভব হয়, তাহলে মালার কোনো প্রয়োজনই নেই।

———०———

সতর্কতাবাণী

গীতাতে দুটি বিষয় ভগবান নিজের থেকে বিশেষভাবে বলেছেন—

(১) সাধনার বিষয়ে (২) অন্তকালের বিষয়ে। মানুষের জীবন ভগবন্ময় হওয়া উচিত, ভগবানের সাধনায় নিয়োজিত হওয়া উচিত এবং মৃত্যুকালে ভগবানের স্মৃতি হওয়া উচিত। এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে ভগবান যতগুলি শ্লোক বলেছেন এবং যতটা উপদেশ দিয়েছেন, অন্য কোনো বিষয় সম্বন্ধে কিন্তু তা করেননি। শেষে বলেছেন—**'মামেকং শরণং ব্রজ'** ; তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব, তুমি চিন্তা কোরো না।

এবারে আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এই সংসার—যাকে নিজের বলে মনে করছেন, তা কিন্তু আপনার সঙ্গে চিরকাল থাকবে না, কখনো থাকবে না।

থে বড়ে-বড়ে মহারাজে,
জিনকে বজে রাত দিন বাজে।
বে ভী বনে কালকে খাজে॥
মিলে নহীঁ বারম্বার শরীর,
উমর ক্যোঁ গফলতমেঁ খোতে হো ?

এই সংসার থেকে আপনি কী নিতে চান ? ধন নিতে চান, সুখ নিতে চান ? কিছুই নিতে পারবেন না। শুধু প্রতারিত হতে হবে। কোনো একজন ব্যক্তিও কি কখনো সংসার থেকে পূর্ণ সুখ লাভ করেছেন ? কেউ কখনো তা লাভ করতেও পারবেন না, কারণ সংসার হল বিনাশশীল এবং ভগবান হলেন অবিনাশী। এই শরীর, সংসার সবকিছু এখানেই থেকে যাবে। শরীরেরও মৃত্যুর পরে অন্ত্যেষ্টি করা হবে। সুতরাং শুরুতেই বিচার করতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে যে আমাদের কী করা উচিত ? যেমন কেউ যদি বাড়ির বাইরে যাত্রা করে, অথচ জানে না যে তাকে কোথায় যেতে হবে,

তখন তার কিরূপ দশা হয়ে থাকে ? যদি কাউকে সে প্রশ্ন করে—আমাকে রাস্তা বলে দিন, তখন উত্তরদাতা প্রশ্ন করবে কোথাকার ? তার উত্তরে সে যদি বলে—আমাকে যে কোনো একটা রাস্তা বলে দিন, তাহলে তো লোকে তাকে পাগল বলে মনে করবে। ঠিক এই কারণেই একটা যে কোনো লক্ষ্য তো থাকা চাই।

সজ্জনবৃন্দ ! আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমাদের জীবন-যাত্রা তো আমাদের জন্মের সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেছে। জীবন প্রতিক্ষণ ক্রমশঃ শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং এই জীবনে কী করা উচিত, এখনো পর্যন্ত আমাদের সেই সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। আমাদের মধ্যে অনেক ভাই-বোন আছেন যাঁদের একেবারেই জানা নেই—আমাদের জীবনের লক্ষ্য কী, আমাদের কোথায় যেতে হবে ? আমি জিজ্ঞেস করে দেখেছি যে বলুন, আপনি কী চান ? কিন্তু এঁরা কোনো কিছুই নির্ণয় করতে পারেন না। কখনো কিছু চেয়ে থাকেন, আবার কখনো অন্য কিছু— এই মাত্রই। এখানকার সমস্ত বস্তুর সঙ্গে তো বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, সেইজন্য কেবল সেই প্রভুকেই স্মরণ করুন যিনি নিত্য-নিরন্তর সর্বত্র বিরাজ করেন।

আপনারা সতর্ক হোন। অন্যকে প্রতারিত করে আমরা যদি কিছু নিয়েও নিই, তাহলে কিন্তু খুব মুশ্‌কিল হবে। কোনো লাভ হবে না। সব কিছু এখানে রয়ে যাবে এবং যথা সময়ে যমরাজের দূতও চলে আসবেন। যে কোনো সময়ে সেই দিন চলে আসতে পারে। কেউ জানে না কখন আসবে, কিন্তু সেই দিন যে আসবেই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপনারা, আমরা সকলে কোথায় বাস করছি, জানেন ? আমরা সকলে মৃত্যুলোকে, মৃত্যুর রাজ্যে বাস করছি। এখানে কেউই অবশিষ্ট থাকবে না, সকলেই কোনো না কোনো সময়ে মৃত্যুবরণ করবেন। সুতরাং আপনারা কী করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন ? যে কাজটা করার কথা, সেটা সম্পূর্ণ করে নিন। এখন না করলে, পরে কখন করবেন ? ছোটো-ছোটো ছেলেরাও এইকথা ভাবে যে বড় হয়ে এটা করব। এখন তো চুলে পাক ধরেছে, তাহলে আর কবে করবেন ? এখন তো মৃত্যুর সময় উপস্থিত।

শরীর যে প্রতিক্ষণ ক্ষয় হচ্ছে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্রও সন্দেহ নেই। জন্মদিনে আপনারা সবাই মিলে আনন্দ করে থাকেন। আরে ! এটা কী আনন্দের একটা দিন ! গভীরভাবে চিন্তা করলে যা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা কিন্তু আনন্দের নয় শোকের। জীবনের একটা বছর কেটে গেল, কিন্তু কি করলাম ? যেটা সদ্ব্যবহার করলে ভগবৎপ্রাপ্তি হতে পারত, বারো মাস ব্যাপী সেই সময়টা আমরা নানা বিষয়ে কাটিয়ে দিলাম। এই কথাটা তো গভীরভাবে বিচার করতে হবে। সুতরাং, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য এইভাবে সাবধান হতে হবে যে, যে সময়টা চলে গেছে, সেটা তো চলেই গেছে। এবার থেকে আমরা আর সময়কে বৃথা চলে যেতে দেব না।

'অন্তহু তোহি তজেঁঙ্গে পামর, তু ন তজৈ অব হী তে।'

এই সমস্ত কিছু আমাদের ত্যাগ করে চলে যাবে, কিন্তু সময়ে-অসময়ে কেবল পরমাত্মাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। হে সজ্জনবৃন্দ, ত্রিভুবনের প্রভুই হলেন কেবল আমাদের ! আর কেউ আমাদের নয়। অতএব, হে প্রভু, হে নাথ ! বলে তাঁকে ডাকুন। প্রভু সর্বদা আছেন সুতরাং এখানেও আছেন, সর্বত্র আছেন। তিনি সকলের, সুতরাং আমারও ; এবং সকলের মধ্যে আছেন সুতরাং আমার মধ্যেও আছেন। তিনি তো স্বয়ং বলেছেন- **'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'**। তিনি প্রাণীমাত্রের সুহৃদ—এমন পরমাত্মা থাকতে যদি আমাদের এমন দুর্দশা হয়, তাহলে আর কী বলা যাবে ? তিনি থাকতে কিনা আমরা দুঃখ পাই, কষ্ট ভোগ করি ! এর কারণ কী ? তাঁর প্রতি বিমুখ হয়ে আমরা বিনাশশীল পদার্থের পিছনে ধাওয়া করছি যাতে ওই সব বস্তু আমরা লাভ করতে পারি, ভোগ করতে পারি এবং তার ফলে মান সম্মান পেতে পারি। কিন্তু আসলে কিছুই লাভ হবে না, শুধু আত্মবঞ্চনাই সার হবে। সব যেমন ছিল তেমনই পড়ে থাকবে, সঙ্গে কিছুই যাবে না। অতএব সকলের উপকার করুন। আপনার সঙ্গে কী যাবে ? সঙ্গে যাবে— স্বভাব। যিনি প্রকৃত সেবক তিনি সর্বত্র সেবা করেন এবং মহা আনন্দ লাভ করেন। আপনার আসল পুঁজী হল আপনার স্বভাব।

একদিনের জন্যও যদি কোথাও যান, তাহলে চিন্তা করেন যে অমুক

জায়গায় থাকতে হবে, অমুক যানবাহন ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই সংসারকে যে একদিন ছাড়তে হবে, একদিন না একদিন যে অবশ্যই ছেড়ে যেতে হবে, সে সম্বন্ধে আপনারা কী কিছু নির্ণয় করেছেন ? প্রত্যেক ভাই-বোনকে স্বয়ং এই কথাটা চিন্তা করতে হবে। এখানে একটি ক্ষণের জন্যও নিশ্চয়তা নেই। হঠাৎ হার্টফেল হয়ে যেতে পারে, যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। আমাদের শরীর কি এমন অবিনশ্বর জিনিস দিয়ে তৈরি যাতে তা অক্ষয় থাকবে ? সুতরাং নিজেদের স্বভাবকে শুদ্ধ করুন। প্রত্যেকের উপকার করুন, হিত সাধন করুন। প্রভুকে স্মরণ করুন। যাঁরা সব সন্ত-মহাত্মা হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ভগবানকে স্মরণ করার জন্যই সন্ত-মহাত্মা হয়েছেন। ভগবানের নাম ব্যতীত সব কিছুই বৃথা, একেবারে বৃথা। অতএব উঠতে-বসতে, শয়নে-জাগরণে, কাজ-কর্ম করার সময় এবং না করার সময়, সর্বদা ভগবানকে ডাকুন। আপনার লাভ হবে। তাঁকে নিরন্তর স্মরণ করুন। সর্বদা নাম-জপ করতে থাকুন।

নাম-জপ করুন। অন্তিমে নামই আপনার কাজে আসবে। ধন, সম্পত্তি, পরিবার, বাড়ি—এসব কোনো কিছুই কাজে আসবে না। এখন পর্যন্ত আপনারা যে সমস্ত কাজে সময় নিয়োগ করার ফলে সৎসঙ্গ, ভজন, ধ্যান, স্বাধ্যায়, পাঠ, জপ ইত্যাদির জন্য কোনো সময় পান না, এর ফলে অন্তিমকালে আপনাদের কি দশা হবে ? তখন অনুশোচনা হবে যে, হায় ! আমরা কিছুই করিনি। এই সমস্ত কাজ-কর্ম কিন্তু 'কিছুই করিনি'র মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অনেকে বলে থাকেন যে সৎসঙ্গের জন্য সময় পাওয়া যায় না। আহা ! এটা কত বড় ভুল ! যখন কোনো বাচ্চা জন্মায়, তখন সে বড় হবে কি হবে না এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে। সে পড়বে কি পড়বে না, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে। তার বিবাহ হবে কি হবে না, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে। কিন্তু তার মৃত্যু হবে কি হবে না, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে কি ? এটা নিশ্চিত যে তাকে তো একদিন মরতেই হবে। এই নিশ্চয়তা সত্ত্বেও যে সমস্ত কাজের সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, তা তো তৎপরতার সঙ্গেই করা হয়, কিন্তু যে কাজ সম্বন্ধে কোনোরকম সন্দেহ নেই— যেমন আমাদের যে

একদিন অবশ্যই চলে যেতে হবে—তার জন্য কোনো রকম প্রস্তুতি কখনোই নেওয়া হয় না। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা ! এটা কত বড় ভুল ! সুতরাং এখন থেকেই সাবধান হয়ে যান।

আমি একটা প্রকৃত সত্য কথা আপনাদের জানাচ্ছি। সেটা হল এই যে ভগবান ছাড়া নিজের বলতে আমাদের কেউ নেই। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, শ্বাস ইত্যাদি কোনো কিছুই আপনার নয়। কিন্তু প্রভুকে আপনি একবার নিজের বলে স্বীকার করে নিলে তিনি কখনো আপনাকে ছেড়ে যেতে পারেন না। এই সমস্ত জিনিস যাদের পিছনে আপনি পড়ে আছেন, তারা কিন্তু কেউই আপনার কথা গ্রাহ্য করবে না। এমনকি যে শরীরকে আপনি সর্বদা রক্ষা করেন, সেই শরীরে একদিনের জন্যও ভুলবশত কোন কারণে অনিয়ম হলে অসুস্থ হয়ে যাবে। এই শরীর কখনো এটা খেয়াল করে না যে এতদিন ধরে এই ব্যক্তি আমাকে রক্ষা করে এসেছে, এত বছর ধরে এ আমাকে অন্ন-জল দিয়েছে, না হয় একদিনের জন্য আমিও একে ক্ষমা করে দিলাম। বরং দুদিনের জন্য অন্ন-জল বন্ধ করে দিলে শরীরের কী রকম দশা হয়ে থাকে ? এ এতই কৃতঘ্ন যে দুদিনেই বিকল হয়ে পড়ে। আর আপনারা এমন কৃতঘ্ন শরীরের গোলাম হয়ে গেছেন এবং যে ভগবানকে স্মরণ করা মাত্রই ছুটে আসেন সেই ভগবানকে স্মরণই করেন না। স্মরণ না করা সত্ত্বেও সেই ভগবান আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, শরীর, জীবন ইত্যাদি সমস্ত কিছুই প্রদান করেছেন এবং এখনো প্রদান করেই চলেছেন। তিনি এমনভাবে আমাদের এই সব দিয়ে থাকেন যে তাঁর দেওয়া বস্তুকে আমরা নিজেদেরই বলে মনে করি। এইরকম পরম সুহৃদ পরমাত্মাকে আপনারা ভুলে থাকেন !

'সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি' (গীতা ৫।২৯)

পরমাত্মা হলেন পাপী, দুরাচারী, সজ্জন ইত্যাদি সকলেরই পরম সুহৃদ। সুতরাং তাঁকে স্মরণ করুন এবং সাথে সাথে সংসারের কাজও সম্পন্ন করুন। সংসারের কাজের মাধ্যমেও ভগবানকে প্রসন্ন করুন। স্বার্থ ত্যাগ করে সেবা করুন। প্রত্যেকে ভাই-বন্ধুদের, স্ত্রী-পুত্রের, সকলের

সেবা করুন, সকলকে সুখ প্রদান করুন, এই ভেবে যে এরা তো সব ভগবানেরই। এমন করলে ভগবান খুব প্রসন্ন হয়ে যাবেন যে এ তো আমার সন্তানদের পালন করছে। যেমন কোনো একটি বাচ্চা যার বাবা-মা নেই, তাকে যদি কোনো ব্যক্তি নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে পালন-পোষণ করে, তাহলে লোকে বলবে যে ভাইটি খুব দয়ালু। কারণ নিজের সন্তানের পালন তো সকলেই করে থাকে, এমনকি কুকুরও নিজের সন্তানের পালন করে থাকে। অতএব সকলের হিত সাধন করতে হবে। যাঁর সঙ্গে নিজের কোনো রকম স্বার্থের সম্পর্ক নেই তাঁর হিত সাধন করা অথবা আপনি যাঁর সেবা করছেন তাঁর সঙ্গে কোনো রকম স্বার্থের সম্পর্ক না রাখা—উভয় হল একই ব্যাপার। সুতরাং স্বার্থ ত্যাগ করে সকলকে সুখ প্রদান করুন, সকলের হিত সাধন করুন।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ভবেত॥

কেউ যেন দুঃখ না পায়, সকলের যেন আরাম লাভ হয়, সকলের যেন সুখ লাভ হয়। সজ্জনবৃন্দ ! এইরকম ভাব গঠন করুন। এটা হল মনুষ্য-জন্মের এক বিশেষ সুযোগ। স্বার্থের জন্য কাজ করা মনুষ্যত্ব নয়। কুকুরের দল নিজেদের মধ্যে খুব খেলা করে, কিন্তু রুটির টুকরো দেখা মাত্রই লড়াই শুরু করে দেয়। এইরকমভাবে যদি স্বার্থের জন্য আমরাও পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করি, তাহলে তাদের আর আমাদের মধ্যে তফাত কোথায় ? সেইজন্য এইভাব সর্বদা বজায় রাখতে হবে যে সকলের হিত সাধন কী করে করা যাবে ? '**তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ**' (গীতা ১২।৪)। যিনি সকলের হিত সাধনে রত, তিনি পরমাত্মাকে লাভ করে থাকেন। অতএব সজ্জনবৃন্দ ! সংসারকে নিজের বলে স্বীকার করে যতটা লাভ করেছেন, তা তো করে দেখে নিয়েছেন, এখন থেকে আপনি ভগবানকে নিজের বলে স্বীকার করে নিন। সকলের ভালো হোক, সকলের শান্তি লাভ হোক, সকলের কল্যাণ হোক—এমন ভাব বজায় রাখুন। যতটা সেবা করতে পারবেন, ততটা করুন। কিন্তু আপনার ভাবের মধ্যে কোনোরকম

ন্যূনতা যেন না থাকে। ভিতরে সর্বদা এই ভাব বজায় রাখতে হবে যে সকলের হিতেই আমার আনন্দ এবং একবার এইভাব জাগ্রত হলে স্বতঃই ত্যাগ হয়ে যাবে। আগে ভাবনা হয়, ক্রিয়া পরে হয়। সুতরাং সকলের হিতের জন্য ভাবুন। যাঁরাই বড়-বড় মহাত্মা হয়েছেন, তাঁরা সকলেই অপরের হিতের জন্য ভেবেছেন।

উমা সন্ত কই ইহই বড়াঈ। মন্দ করত জো করই ভলাঈ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪০।৪)

তাঁদের প্রতি কেউ মন্দ আচরণ করলেও তাঁরা সর্বদা সেই ব্যক্তির হিত সাধনই করে গেছেন। যদি এইপ্রকারে সকলের ভালো হোক, সকলের কল্যাণ হোক—এই ধরনের চিন্তা আপনার মনে সর্বদা জাগ্রত থাকে, তাহলে আপনার উদ্ধার হয়ে যাবে। মহাপুরুষের সঙ্গের দ্বারা, দর্শনের দ্বারা কল্যাণ হয়ে থাকে। এর কারণ কী ? কারণ হল, একান্তে বাস করেও সেই সব মহাপুরুষদের এই চিন্তা থাকে যে সকলের কল্যাণ কী করে হবে ! সেই ধরনের ইচ্ছা থাকার জন্য কেবলমাত্র তাঁদের দর্শনের দ্বারা ও সংসারের হিত সাধন হয়ে থাকে। তাঁদের শরীরে যে হাওয়া স্পর্শ করে, তার দ্বারাও সকলের কল্যাণ হয়ে থাকে।

একটি গূঢ় কথা হল এই যে যেমন পরমাত্মা সকলের হিত চান, তেমনিভাবে যে ব্যক্তি সকলের হিত চায়, সে পরমাত্মার শক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় এবং তার দ্বারা সকলের হিত সাধন হয়ে থাকে।

সুতরাং সজ্জনবৃন্দ ! ভাইয়েরা ! ভগ্নীরা ! আপনারা সকলে আন্তরিকভাবে সর্বদা এই চিন্তা করুন যে সকলের হিত কী করে হবে, সকলের কল্যাণ কী করে হবে। মায়েরা-ভগ্নীরা নিজেরাই বাড়ির কাজ সম্পন্ন করুন এবং সেবা করুন, অপরকে দিয়ে করাবেন না। এই শরীর অল্পদিনের জন্যই পাওয়া গেছে, কয়েকদিন পরেই শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং কিছুদিন শরীরের দ্বারা সেবা-শুশ্রূষা করে নিন, এটির সদ্ব্যবহার করে নিন। কারণ পরে শরীর অসুস্থ হয়ে গেলে তখন ওঠা-বসার জন্যও আপনাকে অন্য লোকের সাহায্য নিতে হবে। বেঁচে থাকলে এইরকম দশা

হতে পারে নইলে তো মরেই যেতে হবে। এই সেবাই হল আসল বস্তু, যা দিয়ে ভগবানকেও জয় করা যায়। সেইজন্য সেবা করুন। বস্তু সামগ্রী অপরকে দান করুন এবং রোজগার কর্ম আপনি নিজেই করুন। দেখুন তাতে পরস্পরের মধ্যে প্রেম জাগ্রত হয় কি না ? পরিবারে ঝগড়া কেন হয় ? এইজন্যই হয় যে আমরা বলে থাকি কাজ-কর্ম তুমি করো, কিন্তু বস্তু-সামগ্রী আমি নেব। এই নিয়ে ঝগড়া হয়ে থাকে।

পরস্পরের মধ্যে প্রেম বৃদ্ধি করার দ্বিতীয় উপায় হল গুরুজনদের চরণে প্রণাম করা। এর দ্বারা সংসারে আসা-যাওয়া মিটে যায়। গুরুজনদের চরণে প্রণাম করুন। তাঁদের আজ্ঞা পালন করুন। তাঁদের সেবা করুন। তাঁরা খুব প্রসন্ন হয়ে যাবেন। তার ফলে পরস্পরের মধ্যে প্রেম বৃদ্ধি হবে, স্নেহ বৃদ্ধি হবে, ঘরে আনন্দ বিরাজ করবে। ধর্ম, সন্ত, মহাত্মা, পরিবার, ভগবান সকলে প্রসন্ন হয়ে যাবেন। কিন্তু যদি কেউ বিরুদ্ধাচরণ করে, ভুল রাস্তায় চলে তাহলে তার প্রতি বাবা-মাও অপ্রসন্ন হয়ে যান। সুতরাং সেবা এবং উপকার করুন এবং ভগবানকে স্মরণ করুন। এই সংসারে চিরদিন থাকার জন্য নয়, এখানে চিরদিন থাকার জন্য আমরা আসিনি, অল্প কয়েকদিনের জন্যই আমাদের এখানে থাকতে হবে। যেমন কিছুদিনের জন্য আপনারা গীতাভবনে সৎসঙ্গে যোগদান করতে এসেছেন এবং পরে আবার এখান থেকে চলে যাবেন, ঠিক তেমনি এই সংসার থেকেও হঠাৎ আপনাদের চলে যেতে হবে এবং কখন যেতে হবে সেটা কারোরই জানা নেই।

তুলসী সোই নর চতুর হৈ জো রাম ভজন লবলীন।
পর ধন পর মন হরন কো বেশ্যা ভী পরবীন॥

যিনি ভগবানের ভজনে নিযুক্ত হয়েছেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান। ভগবানের দরবারেও তাঁকে সমাদর করা হয় কারণ তিনি মনুষ্য-জন্ম সফল করে নিয়েছেন। ভগবান কৃপা করে মনুষ্য-জন্ম দিয়েছেন যাতে সে নিজের কল্যাণ সাধন করতে পারে। কিন্তু যদি মানুষ নিজের কল্যাণ সাধন না করে, তাহলে সে ভগবানের সঙ্গে এক ধরনের প্রতারণাই করে থাকে। সুতরাং

এমন হওয়া কখনো উচিত নয়। আমাদের মনুষ্য শরীর লাভ হয়েছে, উত্তম কুলে জন্মলাভ হয়েছে, ভগবানের দিকে চলার রুচি লাভ হয়েছে, সৎসঙ্গ লাভ হয়েছে, গীতা, রামায়ণের মত গ্রন্থ লাভ হয়েছে এবং ভগবানের নাম শুনতে পাওয়া গেছে। তাহলে আর কী বাকী রইল ? এখন নিজের দিক থেকে অল্প উদ্যোগ নিন। হ্যাঁ- তে-হ্যাঁ মেলান। এইটুকুতেই কল্যাণ হবে। ভগবানের কৃপাকে স্বীকার করে নিয়ে নাম জপ করুন, সেবা করুন এবং দিন-রাত আনন্দে থাকুন ভেবে যে আমি কখনো কোনো অন্যায় করি না, কখনো কাউকে দুঃখ দিই না, তাহলে কিসের জন্য দুঃখ করব, কিসের জন্য চিন্তা করব !

তন কর মন কর বচন কর দেত ন কাহূ দুঃখ।
তুলসী পাতক ঝড়ত হৈ দেখত উসকে মুখ॥

আপনি দৃঢ় সংকল্প করে নিন যে এখন থেকে কাউকে দুঃখ দেব না, মনে কারো সম্বন্ধে খারাপ চিন্তা করব না, জিহ্বা দ্বারা এমন কথা উচ্চারণ করব না যাতে কেউ কষ্ট পায়। এমন কোনো কাজ করব না যাতে কেউ দুঃখ পায়। সকলকে সুখ প্রদান করতে হবে, সেবা করতে হবে—এই মনোভাব নিয়ে সমস্ত প্রাণীর হিত সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করুন। ভগবানের অনন্ত শক্তি, অপার শক্তি আপনার সঙ্গে আছে। এমন করতে পারলেই মনুষ্য-জীবন সফল হয়ে যাবে। কলিযুগের খুব মহিমা, কারণ এই যুগে খুব শীঘ্রই কল্যাণ হয়ে যায়।

কলিজুগ সম জুগ আন নহিঁ জৌঁ নর কর বিখাস।
গাই রাম গুন গন বিমল ভব তর বিনহিঁ প্রয়াস॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১০৩)

বিনা প্রয়াসেই আমরা এই সংসার-সাগর অতিক্রম করতে পারব, এমন সুন্দর সুযোগ আমাদের লাভ হয়েছে। তাই, আমাদের ভগবানের চরণে নিজেদের নিয়োজিত করা উচিত। কেবল ভগবানই হলেন আমাদের নিজের, ভগবান ছাড়া কেউ আমাদের নন, আমরাও অন্য কারোর নই। আমরা সংসারে এসেছি কেবল সেবা করার জন্য। সংসার থেকে কী লাভ

করা যাবে ? সবাই ভাবে যে আমি নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করে নেব, কিন্তু এই মনোভাব দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধ করা কখনোই যাবে না। অপরকে সেবা করুন এবং যিনি আপনার একান্ত নিজের, সেই প্রভুকে স্মরণ করুন। এই জীবন কেবল সেবা করার জন্যই লাভ হয়েছে। অতএব, ন্যায়যুক্ত এবং শাস্ত্রসম্মত ভাবে সকলের সেবা করুন।

উদ্যোগপর্বে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরজীকে ডেকে বলছেন—আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না এর কারণ কী ? উত্তরে বিদুরজী বলছেন—যিনি সৎ-ব্যক্তিদের সঙ্গে শত্রুতা করেন এবং তাঁদের কষ্ট দিতে চান, তাঁর কখনো ঘুম আসবে না। তাঁর মনে সর্বদাই অশান্তি থাকবে। আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে শান্তি চাইছেন ? সুতরাং, যার হৃদয় পাপে পূর্ণ, সে কখনো শান্তি পেতে পারে না। যদি কেউ নিজের স্বার্থ সিদ্ধ হলেই মনে করে যে আমি আমার কাজ সিদ্ধ করে ফেলেছি ; তাহলে কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে তার কাজ সিদ্ধ করতে পারছে না, বরং তা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। এই স্বার্থপরতাই হল মহা পতনের কারণ। সুতরাং এই অল্প পরিসরের জীবনে যতটা সেবা আপনার দ্বারা হওয়া সম্ভব, তাই করুন। যিনি এই মনুষ্যশরীর লাভ করে নিজের কাজ সিদ্ধ করে নিয়েছেন, তিনিই হলেন প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান। তিনি নিজেকে সেবায় নিয়োজিত রাখেন, নাম-জপে নিযুক্ত থাকেন। যদি সকলের মধ্যে বাস করে, সকলের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে এখান থেকে চলে যেতে হয়, তাহলে সেটা তো আপনার পক্ষে খুবই আনন্দের ব্যাপার হবে। কিন্তু যদি আপনার কেবল এই উদ্দেশ্য থাকে যে আমি শুধু সুখ ভোগ করব তাহলে সুখ তো আপনি ভোগ করতেই পারবেন না, বরং বৃথাই সময় নষ্ট করবেন। অতএব এখন থেকেই আন্তরিকভাবে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। নাম-জপ-কীর্তন করুন, সেবা করুন। কত আনন্দের কথা ! এখানে তো চিরদিন কেউ থাকতে পারবেন না। এখান থেকে চলে যেতেই হবে। রাজা, মহারাজা, শেঠ, ধনী, গরীব, ভাই, বোন, পণ্ডিত, মূর্খ—যে কেউই হোন না কেন, সকলকেই এখান থেকে একদিন চলে যেতে হবে।

আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে কি করে বসে আছেন ? কার ভরসায় নির্ভয়ে বসে আছেন ? ভগবানকে স্মরণ করুন। যিনি ভগবানের নাম জপ আন্তরিকভাবে করেন, তিনি বেঁচে থাকলেও আনন্দ (লাভ করেন) এবং মরে গেলেও আনন্দ (লাভ করেন) । তিনি মরে গেলে তো ভগবানকে স্মরণ করতে করতে মরেন এবং বেঁচে থাকলে তো ভজন সংগ্রহ করেন যার ফলে তিনি ধন্য এবং কৃতার্থ হয়ে যান। ভজন হল সেই ধন যা আমাদের সঙ্গে যাবে। কোনো চোর এই ধন চুরি করতে পারবে না, কোনো রাজাও একে হরণ করতে পারবে না। ভাই-ভাইয়ের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় একে ভাগ করা যাবে না। এ হল প্রকৃত পুঁজী যেটা সর্বদা সঙ্গে থাকবে। এ হল এমন মূল্যবান পুঁজী, যার দ্বারা ভগবানকেও জয় করা যাবে।

এ বিষয়ে একটি কাহিনী বলা হচ্ছে। একটি দেশে কোনো একজন ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন করা হত। সে তিন বছর ধরে রাজত্ব করত এবং সমস্ত কিছু তার হুকুম অনুসারেই হত। তিন বছর শেষ হওয়ার পর তাকে কিছু বিশেষ ব্যক্তি মিলে নৌকায় তুলে দিয়ে নদীর ওপারের ভয়ংকর জঙ্গলে ছেড়ে আসত এবং সেখানে জঙ্গলের জানোয়ারেরা তাকে খেয়ে ফেলত। যতদিন সে রাজা থাকত, ততদিন সে আনন্দে থাকত। কিন্তু যেদিন তাকে বিদায় দেওয়া হত, সেদিন সে কান্নাকাটি করত। একবার একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির হাতে রাজত্ব এল। সে খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে তাড়াতাড়ি নদীর ওপারে রাস্তা বানালো, কুয়ো বানালো, বাড়ি বানালো, সমস্ত ধরনের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে নিল। তারপর তিন বছর শেষ হওয়ার পর যখন তাকে যথারীতি লোকেরা বলল— চলো, তখন সেও খুব খুশী হয়ে বললো— চলো। লোকেরা চিন্তা করতে লাগল যে এর এত খুশী হওয়ার কারণ কি ? তাকে তারা জিজ্ঞাসা করল—তুমি এত হাসছ কেন ? সে বলল যে আমি তো হাসব, কাঁদবে তোমরা। আমি সমস্ত মাল ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার পূর্বসূরীরা মূর্খ ছিলেন কারণ তাঁরা হাতে অধিকার থাকা সত্ত্বেও তার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। ঠিক এইভাবে আপনারাও চিন্তা

করুন যে, যদি আমাদেরও তিন বছরের জন্য এমন সুযোগ লাভ হয়, তাহলে আমরাও যেন তার সদ্ব্যবহার করতে পারি। আমাদের তো এই শরীর তিন বছরের (অর্থাৎ কিছু বছরের) জন্য লাভ হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে পরমাত্মার নাম নিন, ভজন-স্মরণ করুন, পুণ্য করুন অথবা পাপ করুন, শুভ কাজ করুন অথবা অশুভ কাজ করুন, এমন স্বতন্ত্রতা লাভ করা হয়েছে। যদি কেউ ভালো কাজ না করে, তাহলে তাকে পরে কাঁদতে হবে—হায়, হায় ! আমি ভালো কাজে সময় ব্যয় করলাম না, ভজন-স্মরণ করলাম না। কিন্তু যদি কেউ ভজন-স্মরণ করে, দান-পুণ্য করে, সকলের হিত সাধন করে, সেবা করে, তাহলে সে খুব আনন্দে মরতে পারে। সুতরাং আর প্রতারিত হবেন না, ভেবে দেখুন, সাবধান হয়ে যান। এখানে তো আপনি প্রতারিত হতে আসেননি। এখন পর্যন্ত যে সময়টুকু চলে গেছে তা তো চলেই গেছে। এখন থেকে আর সময় বৃথা নষ্ট করবেন না। ভজন, ধ্যান করুন, সেবা করুন। আর কত দিন ধরে এই শরীরকে সাজাবেন, বিলাস বহুল সামগ্রী দিয়ে ভূষিত করবেন ? আপনারা বলেন যে এটা ছাড়া যায় না। সত্যিই কি ছাড়া যাবে না ? আপনারা ভেবে দেখুন। সেই দিন আসবে যখন এই সমস্ত কিছু ছেড়ে চলে যাবে। যে দিনের স্মরণ হলেই ভয় হয়, আশংকা হয়, কিন্তু সেই দিন একদিন আসবে। কখন আসবে কেউ জানে না, কারণ মৃত্যু কখনো কাউকে রেহাই দেয় না। মৃত্যুর জন্য সমস্ত ঘণ্টা, সমস্ত মিনিট, সমস্ত সেকেন্ড উন্মুক্ত হয়ে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। তাহলে কি করবেন ? ভগবানের ভজন করুন। প্রত্যেক মুহূর্তে তাকে স্মরণ করুন এবং অপরের সেবা করুন। স্বাভাবিক নিত্য কর্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের নাম জপ করতে থাকুন। তাহলেই উদ্ধার হয়ে যাবেন।

———o———

ব্যবহারের মাধ্যমে পরমার্থলাভ

নিজের স্বার্থ এবং অভিমান ত্যাগ করে 'সকলের হিতসাধন কী করে হবে' এইরকম ভাবনা অন্তরে পোষণ করে সকলের সঙ্গে সেই মতো ব্যবহার করুন। সংসারে থাকার এই হল প্রকৃত বিদ্যা। প্রত্যেকটি কাজ করার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে, একটি বিদ্যা আছে, একটি রীতি আছে এবং সেই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য বুদ্ধিমত্তা এবং কারিগরী দক্ষতারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই প্রকারে সংসারে থাকারও একটি বিশেষ বিদ্যা আছে। আপনি পুত্র হলে বাবা-মার কাছে সুবোধ পুত্র হয়ে যান। ভাই হলে শ্রেষ্ঠ ভাই হয়ে যান। পতি হলে শ্রেষ্ঠ পতি হয়ে যান। পিতা হলে ছেলে-মেয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ পিতা হয়ে যান। যার সঙ্গে আপনার যেমন সম্বন্ধ, তার সঙ্গে আপনার সেইরকম শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়া উচিত। এইভাবে আপনি সকলের সঙ্গে ক্রমশঃই ভালো ব্যবহার করলে, তারাও আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। তবেই সংসারে সুখ বজায় থাকবে। আপনি বলতে পারেন যে সংসারের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি এইরকমভাবে চিন্তা করে তবেই তা হওয়া সম্ভব, শুধু একজন ব্যক্তির পক্ষে এটা কেমন করে করা সম্ভব ? কথাটা ঠিকই ; কিন্তু আপনি সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার শুরু করুন। আপনার ব্যবহার ভালো হওয়ার ফলে সংসারের অন্যান্য লোকেদের ব্যবহারও ভালো হয়ে যাবে এবং সংসারে খুব শান্তি বিরাজ করবে।

আপনি নিজের তরফ থেকে সঠিক আচরণ সর্বদা বজায় রাখুন। আপনার আচরণে যেন ক্রমশঃ সহনশীলতার প্রকাশ বৃদ্ধি পায়। রামায়ণে বলা হয়েছে—

উমা সন্ত কই ইহই বড়াঈ। মন্দ করত জো করই ভলাঈ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪০।৪)

পরিবারের লোকেরা যদি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে,

আপনাকে দুঃখ দেয়, আপনার নিন্দা করে, তিরস্কার করে, অপমান করে, তাহলেও আপনি যেন কখনো তাদের ক্ষতি করবেন না, তাদের দুঃখ দেবেন না। আপনি সর্বদা তাদের সুখ দেবেন, তাদের সমাদর করবেন, তাদের প্রশংসা করবেন। তাদের আপনি কী করে সুখ প্রদান করবেন—এই চিন্তা সর্বদা বজায় রেখে যদি আপনি সেই মতন আচরণ করেন, তাহলে সংসারের কেউ কখনোই আপনার জন্য দুঃখের কারণ হতে পারবে না। সংসারের লোকেরা তখন পরস্পরের প্রতি সঠিক আচরণ শুরু করবে। এই যুগে এই জিনিসটার খুব বেশি প্রয়োজন।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন (গীতা ২।৪৭)

আপনি কেবল নিজের তরফ থেকে সংসারের লোকেদের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করুন। দুটি জিনিস। একটি হল কর্তব্য এবং অন্যটি হল অধিকার। মানুষ তো শুধু অধিকার দাবী করে, নিজের কর্তব্য পালন করে না। এটাই হল মূল রোগ যার জন্য সংসারে এবং গৃহে অশান্তি হয়ে থাকে। লোকে নিজের অধিকার বজায় রাখতে চায় এবং কর্তব্য-পালন করতে ফাঁকি দেয়, উপেক্ষা করে অথবা কর্তব্য পালন করেই না। এর জন্যই অশান্তি হয়। সেই জন্য অধিকার দাবী করবেন না এবং নিজের কর্তব্য-পালন করায় কিঞ্চিৎমাত্রও ঘাটতি রাখবেন না। অপরের অধিকার আপনি পুরো মাত্রায় রক্ষা করবেন এবং আপনার কাছে তাদের যে প্রত্যাশা আছে সেটা নিশ্চয় পূরণ করবেন। আপনি কখনো অন্যের কাছে নিজের অধিকার দাবী করবেন না এবং বলবেন না যে এ তো আমার ছেলে, তাহলে আমার কথা কেন শোনে না ? আমার স্ত্রী কেন আমার কথা শোনো না ? এই ধরনের অধিকার দাবী করার ইচ্ছা কখনো নিজের ভিতরে পোষণ করবেন না। অন্যদের সঙ্গে সর্বদা প্রেম, স্নেহ, প্রীতি এবং সৌহার্দ্য বজায় রেখে কথা বলবেন, কিন্তু নিজের ভিতরে এই আগ্রহ কখনো রাখবেন না যে আমার স্ত্রী-পুত্র যেন আমার কথামতনই চলে।

যে পরিমাণে সংসারের লোকেরা আপনার কথা মতন চলবে, সেই পরিমাণে আপনার বন্ধন দৃঢ় হয়ে যাবে। যে পরিমাণে তারা আপনার কথা

মতন আচরণ করবে না, ততটাই কিন্তু আপনার বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে, ততটাই আপনি স্বতন্ত্র হয়ে যাবেন, ততটাই আপনার লাভ হবে। যতটা তারা আপনার অনুগত হয়ে যাবে, ততটাই আপনার বন্ধন দৃঢ় হবে। সকলের তো কেবল এটাই ভালো লাগে যে অপরে আমার প্রতি অনুকূল আচরণ করবে, আমার কথা শুনবে। কিন্তু এটাই হল বন্ধনের কারণ। বিষ মিষ্টি হলেও কিন্তু তার ফল বিষময়। এই প্রকারে অনুকূলতা আপনার ভালো লাগলেও তা কিন্তু বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে। অপরে যদি উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে, তা সত্ত্বেও আপনি তার সঙ্গে ভালো আচরণ করবেন। সে যদি সারাজীবন ধরে আপনার সঙ্গে শুধু খারাপ আচরণই করে, তাহলেও আপনি কখনো বিচলিত হবেন না। কারণ এটা তো আপনার পক্ষে একটি সুবর্ণ সুযোগ। সে আপনার ক্ষতি করলেও আপনি নিজে সবসময় তার প্রতি ভালো আচরণই করবেন।

একজন সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাউকে বলেছিলেন যে আপনি যা কিছুই করুন না কেন আমার কখনো ক্রোধ হয় না। আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। এর উত্তরে একজন তাঁকে বলেছিলেন যে আপনার যে ক্রোধ হয় না, এটা তো খুব ভালো কথা। কিন্তু আপনার ক্রোধ উৎপন্ন করার জন্য আমার নিজের স্বভাব কেন খারাপ করব ? সুতরাং সর্বদা এই ভাব যেন আমাদের বজায় থাকে, যে আমরা আমাদের নিজেদের স্বভাব ভালো রাখব।

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। (গীতা ১৮।৪৫)

আপনারা নিজেদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করুন। তাহলে তার ফলও আপনার পক্ষে হিতজনকই হবে। সংসারের লোকেদের সঙ্গে এইভাবে ব্যবহার করলে আপনার ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই সুখদায়ক হবে। এখানেও আপনার সুখকর হবে এবং ওখানেও তাই হবে। গীতাতে বলা হয়েছে—'**নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ**' (৪।৩১)। যারা যজ্ঞ করেন না তাঁদের ইহলোকও সুখদায়ক হয় না, তাহলে পরলোক তো দূরের কথা ! এখানে 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ হল কর্তব্য-পালন করা। যারা

নিজেদের কর্তব্য পালন করেন না, তারা ইহলোকেও সুখ পান না এবং পরলোকেও পান না। যে ব্যক্তি কেবল নিজের স্বার্থই সিদ্ধ করতে চায় কেবল নিজের জন্য সুখ চায়, তার সংসারেও সমাদর লাভ হয় না এবং পারমার্থিক উন্নতিও লাভ হয় না। যে নিজের স্বার্থ এবং অভিমান ত্যাগ করে কেবল অপরের হিতের জন্য কাজ করে, সে সংসারে সমাদর এবং সম্মান লাভ করে। তার পরমার্থ লাভও হয়ে থাকে। সে ইহলোক এবং পরলোক, উভয় লোকেই সুখ লাভ করে।

অনেকের এইরকম ধারণা আছে যে আমরা যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করি তাহলে আমাদের সংসারে ব্যবহার ঠিক থাকবে না, এবং যদি সংসারে আমাদের ব্যবহার ঠিক থাকে তাহলে আমাদের পরমার্থ সিদ্ধ হবে না। এই ধারণা ঠিক নয়। গীতাতে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। আপনি যদি সঠিক ব্যবহার করেন তাহলে আপনার ইহলোক-পরলোক উভয়ই সুখদায়ক হবে। আপনার ব্যবহারেও উন্নতি হবে এবং পরমার্থেও উন্নতি হবে। সংসারে ব্যবহারের মাধ্যমেই পারমার্থিক উন্নতি লাভের বিদ্যা শিক্ষা করতে হবে। যেমন—একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কোনো বিচারক যদি দয়ালু হন, তাহলে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারবেন না, এবং যদি তিনি ন্যায়নিষ্ঠ হন, তাহলে তিনি দয়া প্রদর্শন করতে পারবেন না। কারণ দয়া প্রদর্শন করলে তো রেহাই দিতে হবে, সুতরাং ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারবেন না, এবং যদি ন্যায়নিষ্ঠ হন, তাহলে দয়া প্রদর্শন কী করে করবেন ? কিন্তু ভগবানের এমন মহিমা যে তিনি যেমন দয়ালু, তেমনই তিনি ন্যায়নিষ্ঠ। এই দুয়ের মধ্যে কোনো রকম স্ববিরোধিতা নেই, কারণ ভগবানের তৈরি করা আইনে পূর্ণ মাত্রায় দয়া নিহিত আছে। যেমন ভগবান বলেছেন— 'মানুষ অন্তকালে যে যে ভাব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, সেই সেই ভাব অনুসারেই তার গতি হয়ে থাকে।'

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

(গীতা ৮।৬)

এটাই নিয়ম যে মানুষ যে যে ভাব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, সে সেই ভাব অনুসারেই পরে জন্মলাভ করে থাকে। অন্তকালের চিন্তন অনুযায়ী মানুষের গতি হয়ে থাকে। **'অন্ত মতি সো গতি'**। এই হল ভগবানের অমোঘ আইন। ভগবান বলেছেন যে অন্তকালে আমাকে স্মরণ করলে তুমি আমাকেই লাভ করবে। পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার জন্য কেবল অন্তকালে পরমাত্মাকে চিন্তা করলেও পরমাত্মাকে পাওয়া যাবে। এখানে তাঁর বিশেষ এবং অভূতপূর্ব দয়ার নিদর্শন হল এই যে, যে মূল্যের বিনিময়ে কুকুরের যোনিতে জন্মলাভ হয়ে থাকে, সেই একই মূল্যের বিনিময়ে পরমাত্মাকে লাভ করা যেতে পারে। তাহলে কতটা খরচ করতে হয়, বলুন ? কুকুরের চিন্তা করতে করতে মরলে আপনি কুকুর হয়ে জন্মাবেন এবং পরমাত্মাকে চিন্তা করতে করতে মরলে তো আপনি পরমাত্মাকেই লাভ করবেন। এই হল ভগবানের আইন যা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং কাউকেই তিনি এর থেকে রেহাই দেননি। এর মধ্যে তাঁর কত বড় দয়া নিহিত আছে। যে চিন্তনের মাধ্যমে চুরাশী লক্ষ যোনি লাভ হয়, সেই একই চিন্তনের মাধ্যমে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে যেতে পারে, চিরদিনের জন্য জন্ম-মৃত্যু মিটে যেতে পারে। ভগবানের এমনই মঙ্গলময় অনুশাসন (আইন)। এইরকম তাঁর আইনও আছে এবং সেই আইনে তাঁর দয়াও নিহিত আছে। এই প্রকারে নিজেদের ব্যবহার ঠিক করতে পারলে পরমার্থ লাভ সহজেই হয়ে থাকে। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে পরমার্থ লাভে বাধা সৃষ্টি হয় না। মিথ্যা, কপটতা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা করলে পরমার্থ লাভে বাধা সৃষ্টি হয়। অনেকে তো এইসবের মধ্যে লাভ দেখতে পায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসবের দ্বারা কোনো লাভই হয় না।

কারোর সঙ্গে কপটতা করলে, দ্বেষ করলে, চালাকী করলে, প্রতারণা করলে কী হয় ? যেমন একটা কথা প্রচলিত আছে— **'হাঁড়ী কাঠকী চঢ়ে ন দূজী বার'**। কাঠের হাঁড়ি একবার উনুনে চড়ানো হলে আর দ্বিতীয়বার কি চাপানো যায় ? ঠিক তেমনিভাবে একবার যদি কারো সঙ্গে প্রতারণা করা হয়, তাহলে কিন্তু পরে তার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবেই। ফলে ব্যবহারও

তখন ঠিক থাকবে না। অতএব নিজের স্বার্থত্যাগ এবং অপরের হিতের জন্য চিন্তা করলে ব্যবহার ঠিক হয়ে যাবে এবং ব্যবহার ঠিক হয়ে গেলে তখন পরমার্থও সিদ্ধ হয়ে যাবে। স্বার্থ এবং অহংকার ত্যাগ করতে পারলেই সমস্ত কাজ সিদ্ধ হয়ে যায়—এটা খুবই লাভজনক কথা।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ব্যবহারের মাধ্যমে পরমার্থ লাভের শিক্ষা প্রদান করেছে। অতএব গীতা পড়ুন। গীতার অধ্যয়ন করুন। গীতার উপদেশ সম্বন্ধে বিচার করুন এবং সেই অনুসারে নিজের জীবন গঠন করুন। দেখবেন, কত স্বাভাবিকভাবে আনন্দ এবং প্রশান্তি লাভ হবে ! গীতা এই শিক্ষা প্রদান করেছে যে কেবল ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারলে পরমার্থ স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়। প্রকৃত সিদ্ধান্ত হল এই যে পরমার্থ তো স্বতঃসিদ্ধ হয়েই আছে। কেবল ব্যবহারই নষ্ট হয়ে গেছে, অন্য কিছু নষ্ট হয়নি। জীবাত্মা, পরমাত্মা, কল্যাণ কোনো কিছুই নষ্ট হয়নি। কেবল ব্যবহারই নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং ব্যবহার শুদ্ধ করুন। সমস্ত কাজ সিদ্ধ হয়ে যাবে।

———o———

ক্রোধকে জয় করার উপায়

যেমন হিসাব নিকাশ শেখার সময় তার সূত্রগুলি জেনে নিলে আপনারা খুব সহজেই হিসাবনিকাশ করতে পারবেন, তেমনি প্রত্যেক প্রশ্নেরও একটি বিশেষ সূত্র থাকে যেটি জেনে নিলে সেই প্রশ্নের উত্তর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনারা জানতে পারবেন।

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে কি করে ক্রোধ জয় করব ? এখন, প্রশ্ন হল এই যে ক্রোধ উৎপন্ন হয় কী করে ? গীতায় বলা হয়েছে— '**কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে**' (২।৬২)। এই কাম (কামনা) কী ? লোকের তো শুধু এই রকম ধারণা আছে যে 'ধন, সম্পত্তি, বৈভব ইত্যাদির কামনাই হল কামনা'। এইসব তো কামনা ঠিকই, কিন্তু মূল প্রকৃত কামনা হল কোনটি ? 'এটা হওয়া উচিত আর এটা হওয়া উচিত নয়'—অন্তরের এই আগ্রহকেই কামনা বলা হয়।

আপনি যদি প্রথমেই মনে এই ধরনের আশা রাখেন যে 'এটা হওয়া উচিত' এবং প্রকৃতপক্ষে যদি সেইরকম না হয় তাহলে ক্রোধ উৎপন্ন হবে, এবং কেউ যদি আপনার আশা মতো আচরণ না করে, তাহলেও ক্রোধ উৎপন্ন হবে। যদি আপনি এই ধরনের আগ্রহ রাখেন যে 'এটা হওয়া উচিত নয়' এবং প্রকৃতপক্ষে যদি এর বিপরীত হয় বা কেউ যদি বিপরীত আচরণ করে, তাহলে ক্রোধ উৎপন্ন হবে। এটা হওয়া উচিত আর এটা হওয়া উচিত নয়—বাস্তবিক এই ধরনের আগ্রহই হল ক্রোধের প্রকৃত কারণ।

এটা হওয়া উচিত আর এটা হওয়া উচিত নয়— এই ধরনের আগ্রহ থাকলে কোনো লাভ হয় না ; কারণ কেউ কি কখনো আমাদের জিজ্ঞেস করে কোনো কিছু করবে ? আমাদের মনের আগ্রহানুসারেই কি আচরণ করবে ? আপনি তো নিজের স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য প্রভৃতির কাছে এটাই আশা করেন যে তারা যেন আপনার কথা মান্য করে চলবে, কিন্তু তাদের কি মন

নেই ? তাদের কি নিজস্ব কোনো মতামত নেই ? তাদের কি কোনো কামনা চাহিদা নেই ? এটা করব আর এটা করব না—এইরকম আগ্রহ কি তাদের মনে জাগে না ? যদি তাদের মন এই সমস্ত থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে তো তারা আপনার কথা মতনই আচরণ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মনেও যখন 'এটা করব আর এটা করব না'— এই দুটি চিন্তা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করছে, তখন তারা আপনার কথাকেই শুধু কেন মান্য করবে ? তারা যদি আপনার কথাকেই মান্য করে চলে, তাহলে আপনারও উচিত তাদের কথা মান্য করে চলা। যখন আপনি তাদের কথা মান্য করার জন্য প্রস্তুত নন, তখন আপনার কথা মান্য করার জন্য তাদের ওপর আপনার কিসের অধিকার ? সুতরাং 'এটা হওয়া উচিত আর এটা হওয়া উচিত নয়'—এই প্রকার আগ্রহ যদি আপনার মনে থাকে, তাহলে অপর কোনো ব্যক্তির পক্ষে 'তদনুরূপই করা উচিত'—নিজের এই রকম ইচ্ছা আপনাকে ত্যাগ করতে হবে। এই ধরনের ইচ্ছা থাকার জন্য আপনার অভিমান অর্থাৎ আমি বড় এবং অন্যদের উচিত আমার কথা মেনে চলা — এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানই হল প্রকৃত কারণ ; এবং অন্যরা যদি আপনার কথা না মেনে চলে, তখন এই অভিমানই ক্রোধরূপে পরিণত হয়ে থাকে।

যদি আপনি প্রকৃতই শান্তি চান তাহলে অভিমান ত্যাগ করুন ; কারণ এই অভিমানই হল সমস্ত আসুরী সম্পত্তির মূল। অভিমানরূপ এই তরুবরের মূলে আসুরী সম্পত্তিরূপ কলিযুগ বাস করে। আসুরী সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত যতরকম দুর্গুণ আছে যেমন—ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, ঈর্ষা, দম্ভ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি এই সবই অভিমানের আশ্রিত থাকে, কারণ অভিমানই হল এদের প্রভু। সুতরাং অভিমান ত্যাগ না করতে পারলে আপনি ক্রোধ কী করে ত্যাগ করবেন ? অতএব প্রথমেই এই অভিমান অর্থাৎ অহং-কে ত্যাগ করুন।

অহং ত্যাগ করার উপায় কী ? যারা আপনার কথা মান্য করে না, তারা তো প্রকৃতপক্ষে আপনার অভিমান ত্যাগ করার সহায় হন এবং যারা আপনার কথা মান্য করে তারা কিন্তু আসলে আপনার অভিমানকে পুষ্ট

করে থাকেন—এই সত্য কথাটা কি আপনার মনঃপূত হয় ? বাস্তবিক যারা আপনার কথা মান্য করে না, তারা আপনার যতটা উপকার করে, যতটা হিতসাধন করে, অপরপক্ষে যারা আপনার কথা মান্য করে, তারা ততটা উপকার, ততটা হিতসাধন করে না। যদি আপনি নিজের উদ্ধার চান, তাহলে আপনার অভিমানে যত আঘাত লাগে, ততই আপনার পক্ষে মঙ্গল। কেউ আপনার কথা মান্য না করলে তাতে আপনার লাভ হবে, ক্ষতি নয়। আপনার অভিমান পুষ্ট করার জন্য সেইসব ব্যক্তিদেরই ভালো মনে করা হয় যারা আপনার কথা মান্য করে ; কিন্তু আপনার অভিমান দূর করার জন্য সেইসব ব্যক্তিরাই প্রকৃত ভালো যারা আপনার কথা মান্য করে না। সেইজন্য আপনাকে তাদের এই কাজটিকে উপকাররূপে স্বীকার করে নিয়ে এই কথাটি দৃঢ়ভাবে অনুধাবন করতে হবে যে বাস্তবিক আমার মঙ্গল এর মধ্যেই নিহিত আছে।

যদিও তারা জেনে বুঝে আপনার হিতসাধন এই ভেবে করছে না যে ভাই, আপনার অভিমান (অহং) দূর করার জন্যই আমি আপনার কথা মান্য করছি না ; তবুও আপনার আখেরে সেই লাভই হচ্ছে, কারণ তারা আপনার অভিমানকে দৃঢ় করছে না অর্থাৎ আপনার অভিমান পুষ্ট হতে পারছে না। আপনি কি নিজের মঙ্গল চান, না অমঙ্গল চান ? কল্যাণ চান, না পতন চান ? যদি আপনি নিজের কল্যাণে ইচ্ছুক তাহলে নিরভিমান হতে পারলেই আপনার কল্যাণ হবে এবং আপনি তখনই নিরভিমান হবেন, যখন আপনার কথা কেউই মান্য করবে না। যদি সকলেই আপনার কথা (সর্বদা) মান্য করে চলে তাহলে আপনার কথা সর্বত্র মান্য হওয়ার দরুণ আপনার মধ্যে অভিমান দৃঢ় হয়ে যাবে। এই অভিমান হল আসুরী সম্পত্তি — '**দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ**' (১৬।৪)। সুতরাং যারা আপনার কথা মান্য করে না, তারা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনার বিশেষ উপকার সাধন করছে। আপনার আসুরী সম্পত্তির অপসরণ করে আপনার মধ্যে দৈবী সম্পত্তির বিকাশ ঘটাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন করা হয়েছে যে কথা মান্য না করলে তো ছেলে অবাধ্য হয়ে

যাবে ? আপনার কথা মান্য করলে আপনি অভিমানী হয়ে যাবেন অর্থাৎ আপনার অহং-ভাব পুষ্ট হবে এবং আপনার কথা মান্য না করলে আপনার ছেলে অবাধ্য হয়ে যাবে—এখন এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে গভীরভাবে বিচার করুন। যদি এমন হয় যে, আপনাকে জগৎ থেকে আগেই চলে যেতে হয় ; তাহলে আপনার অবর্তমানে তো ছেলে অবাধ্য হবে কিন্তু আপনার অহং-ভাব তো দূর হল না ! অর্থাৎ আপনি না থাকলেও ছেলে অবাধ্য হবে কিন্তু আপনার অহং তো থেকেই যাবে। সুতরাং আপনার উচিত প্রথমেই নিজের অভিমান (অহংভাব) দূর করতে সচেষ্ট হওয়া।

দ্বিতীয় কথা হল যে আপনি যদি তাদের প্রতি নিজের অধিকার দাবী না করেন তাহলে আপনার সৌম্যাবস্থা এবং নিরভিমান অবস্থার প্রভাব তাদের ওপর পড়বে, যার ফলে তারা আর অবাধ্য থাকবে না, ঠিক হয়ে যাবে। আপনি হয়ত তাদের বললেন—'বাছা ! এইরকম কাজ করা উচিত নয় ; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তারা অন্যথা করে, তখন আপনি শান্তি বজায় রেখে চুপ-চাপ থাকবেন। কারণ তারা যদি অবাধ্য হয়, তাহলে তার তেমনই ফল লাভ হবে। ফল লাভ করার পর তাদের নিজের বোধ জাগ্রত হবে, যার দরুন তাদের অবাধ্যতা স্বতঃই মিটে যাবে। তাদের নিজেদের বোধ জাগ্রত হওয়ার পর তাদের অবাধ্যতা যেমনভাবে অতি সহজেই মিটে যাবে, আপনার কথার দ্বারা তেমনভাবে কখনোই মিটবে না ; কারণ তাদের মনের মধ্যে নিজের কথার প্রতি আগ্রহ পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকার জন্য আপনার কথা নিকেল করা অথবা পালিশের মতো তাদের মনের উপর উপর ছাপ ফেলবে, সময় মতো তা মুছে যাবে, অর্থাৎ এইভাবে তাদের অন্তর থেকে শোধরানো যাবে না। সুতরাং তাদের অবাধ্যতা মেটানোর প্রকৃত উপায় হল—আপনি নিজের অভিমান (অহং) দূর করুন।

যদি মানুষ সংসারে থাকতে চায়, তাহলে সংসারে বাস করার রীতি তার শেখা উচিত। সংসারে বাস করার কৌশল হল—অপরের কথা মান্য করতে হবে এবং তাদের মনের ইচ্ছানুসারে চলবে হবে। নিজের কর্তব্য পালন করতে হবে এবং তাদের প্রসন্নতা অর্জন করতে হবে।

সংসারে বাস করার অর্থ কী ? আপনার শুধুমাত্র কর্তব্য পালনেরই দায়িত্ব রয়েছে। আপনার কর্তব্য কী ? স্ত্রী মানুক, না মানুক ; পুত্র মানুক, না মানুক ; ভাই মানুক, না মানুক ; বাবা-মা মানুক, না মানুক ; ভাগ্নে এবং ভাগ্নী মানুক, না মানুক, আপনি কেবল নিজের কর্তব্যের পালন সঠিকভাবে করবেন। সংসারের অন্যান্য ব্যক্তিরা তাদের কর্তব্য পালন করছে, কি করছে না, সেইদিকে আপনি কোনোরকম দৃষ্টিপাত করবেন না। কারণ যে মুহূর্তে আপনি তাদের কর্তব্য দেখে বিচার করবেন যে 'এরা অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে !' সেই মুহূর্তে আপনি কিন্তু নিজেই কর্তব্যচ্যুত হয়ে যাবেন, নিজের কর্তব্য থেকে সরে যাবেন। অপরের দোষ দেখা কি আপনার কর্তব্য ? এ কথা কোথায় বলা হয়েছে ? শাস্ত্রে কোথাও বলা হয়নি যে আপনি অপরের দোষ দর্শন করুন ; বরং এটাই বলা হয়েছে যে এই সংসার হল গুণ-দোষময়।

সুনহু তাত মায়া কৃত গুন অরু দোষ অনেক।
গুন য়হ উভয় ন দেখিঅহিঁ দেখিঅ সো অবিবেক॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪১)

অপরের গুণ থেকে শেখার থাকতে পারে কিন্তু দোষদৃষ্টি কখনো করবেন না। অপরের দোষ দেখলে সেই দোষ আপনার মধ্যে বর্তাবে। অপরের দোষ দর্শন করে, তাকে অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত করার জন্য ক্রোধ প্রদর্শন করলে, কিন্তু আপনি ক্রোধের প্রভাব থেকে বাঁচতে পারবেন না। সেইজন্য, আপনি কেবল নিজের কর্তব্য পালন করবেন। অপরের কর্তব্যের প্রতি এবং দোষের প্রতি কখনো দৃষ্টিপাত করবেন না। হ্যাঁ, আপনার পুত্র থাকলে তাকে ভালো শিক্ষা দেওয়া আপনার কর্তব্য, তাকে ভালো উপদেশ দেওয়া আপনার কর্তব্য, কিন্তু সে আপনার কথামতনই আচরণ করবে—এই আগ্রহ পোষণ করা কিন্তু আপনার কর্তব্য নয়। এটা তো তার কর্তব্য। তাকে কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ করা—এটা কিন্তু আপনার কর্তব্য নয়। আপনার তো তাকে শুধু এটুকুই বলা কর্তব্য যে বাছা ! এটা করা উচিত, এটা করা উচিত নয়। যদি সে আপনাকে বলে—'না-না বাবা,

এটাই করব', তাহলে তাকে বলবেন—'ঠিক আছে, তাই করো!' এটা হল একটা মোক্ষম ওষুধ। আমি একটা গোপন কথা আপনাদের বলছি যে আমি নিজেও এই ওষুধ সেবন করেছি। আপনাকে যে ওষুধ সম্বন্ধে বললাম, সেটা একেবারেই অব্যর্থ ওষুধ। আপনি যদি তাকে বলেন—'এটা করো' আর সে যদি বলে—'না, আমি করব না' তখন আপনি তাকে বলবেন—'ঠিক আছে, তাই করো।'

রজ্জব রোস ন কীজিয়ে কোঈ কহে ক্যূঁ হী।
হঁসকর উত্তর দীজিয়ে হাঁ বাবাজী য়ূঁ হী॥

অন্যায় বা পাপ হলে আপনি স্বীকার করবেন না। আপনি তো শাস্ত্রের অনুসারে তাকে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সে যদি তা না মান্য করে, তাহলে শাস্ত্র কী বলছে ? তার সঙ্গে লড়াই করো অথবা, তার প্রতি অধিকার ফলাও ? আপনার তো কেবল সঠিক পরামর্শ দেওয়ার অধিকার আছে —'**কর্মণ্যেবাধিকারস্তে**' (২।৪৭) এবং সে যে সেটাই মেনে নেবে—এটা হল ফল, এতে কিন্তু আপনার অধিকার নেই— '**মা ফলেষু কদাচন**' (২।৪৭) আপনি তো সৎ পরামর্শ দিয়ে নিজের দায় সেরেছেন। আপনার কর্তব্য হল তাকে সৎ-পরামর্শ দেওয়া, কিন্তু তাকে সেটি পালন করতে বাধ্য করা কখনোই আপনার কর্তব্য নয়। সেইরকম, অর্থাৎ পরামর্শ মতো কাজ করা তো তার কর্তব্য। আপনার কর্তব্য তাকে কেবল পরামর্শ দেওয়া। সে কর্তব্য-পালন করলে আপনার কল্যাণের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি হবে না এবং কর্তব্য-পালন না করলে তারই লোকসান হবে, আপনার তো কোনোমতেই ক্ষতি হবে না, কারণ আপনি তো তাকে ভালো উপদেশ দিয়েছেন। এটি খুবই মূল্যবান কথা।

মমতা ত্যাগের ফলে নিত্য সুখ

প্রকৃতপক্ষে আপনারা কেউই মমতা (মমত্ব) ত্যাগ করতে চান না। এই বিষয়ে প্রায় সকলের ভুল হয়ে থাকে। মমতা ত্যাগ করা যায় না—এটা কিন্তু ঠিক নয় ; বাস্তবিক আপনারা নিজেরাই মমতা ত্যাগ করতে চান না। অতএব মমতা ত্যাগ করার ইচ্ছা জাগ্রত হবে কী করে—এটাই হল মূল প্রশ্ন। সুতরাং এই সম্বন্ধে আপনারা সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখুন যে আপনার কোন-কোন বস্তুর প্রতি মমতা আছে। আপনার তো সবচেয়ে অধিক মমতা আছে নিজের শরীরের প্রতি, তারপর আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির প্রতি। এবার বিচার করে দেখুন যে এই সমস্ত বস্তু, যাদের প্রতি আপনার মমতা আছে, তারা কি সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকবে ? যেমন আপনি যখন পূর্বজন্মে অন্য কোনো শরীর ধারণ করেছিলেন, তখন সেই শরীর, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে আপনি তো তখন নিজের বলে মনে করতেন, কিন্তু আজ তাদের কোনো কথাই আপনার মনে নেই। ঠিক তেমনিভাবে আজ যাদের প্রতি আপনার মমতা আছে, সেই সব বস্তুর স্মৃতিও মৃত্যুর পর আপনার মনে থাকবে না, কারণ সমস্ত কিছুর সঙ্গে তো আপনার বিচ্ছেদ হয়েই যাবে। বস্তুর সঙ্গে তো আপনার বিচ্ছেদ হয়ে যাবেই, কিন্তু তাদের প্রতি আপনার যে অনুরাগ, মমতা আছে—সেটা কিন্তু মৃত্যুর পরও আপনার সঙ্গে থাকবে। সুতরাং, কেবল জন্ম-মরণ, দুঃখ লাভ করা ব্যতীত মমতার দ্বারা অন্য কিছু লাভ হয় না।

সমস্ত রকমের পদার্থ এবং মমতা সৃষ্টিকারী বস্তু ইত্যাদির সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, কিন্তু মমতা টিকে থাকবে। তারপর সেই মমতা থেকে ক্রমে আসক্তি এবং কামনা উৎপন্ন হয়ে বন্ধনের সৃষ্টি হবে। যার সঙ্গে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তা থেকে মমত্ব সরিয়ে নেওয়া এমন কী কঠিন কাজ ? যা থেকে অতি অবশ্যই বিচ্ছেদ হবে, সেই সকল বস্তুদের প্রতি মমতা ত্যাগ করতে পারলে আপনি ধন্য হয়ে যাবেন, মুক্ত হয়ে যাবেন। মমতা

থাকাকালীন মৃত্যু হলে বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং মমতা ত্যাগ করলেও বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুতে পরাধীনতা আছে এবং ত্যাগে স্বাধীনতা আছে। মৃত্যুতে অশান্তি আছে এবং ত্যাগে শান্তি আছে। মৃত্যু হলে বাইরে থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু ভিতরে মমতা-আসক্তি থাকার ফলে বিশেষ দুঃখ লাভ হয়, কিন্তু ত্যাগ হলে ভিতর থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় এবং বাইরে থেকেও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলে ক্ষতি হয় না, বরং বিশেষ আনন্দ লাভ হয়।

আমার তো একটিমাত্র প্রার্থনা যে আপনারা এই কথাগুলো অঙ্গীকার করুন, মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং নিজেরা বিচার করুন। মমতা পোষণ করলে আপনার কেবল লোকসান হবে। অপরপক্ষে, মমতা ত্যাগ করলে আপনার কোনো লোকসান হবে না, দুঃখ হবে না এবং সুখের ঘাটতিও হবে না। যেমন, এই বাড়িটাকে আপনারা কেউই নিজের বলে মনে করেন না। তাই বলে এখানে বসে কি আপনারা সুখ লাভ করছেন না ? এখানকার বৈদ্যুতিক আলোর দ্বারা কি আমরা উপকৃত হচ্ছি না ? এখানে যে পাখা চলছে, তার দ্বারা কি আমরা সুখ লাভ করছি না ? এখানে মাইকের মাধ্যমে যে কথা বলা হচ্ছে তা শুনে কি আমরা লাভান্বিত হচ্ছি না ? এর তাৎপর্য হল এই যে মমত্ববোধ না থাকলেও সুখ লাভ করায় কোনো ঘাটতি হয় না ! এই বস্তুগুলি আমাদের নিজস্ব নয় অথচ এদের দ্বারা আমরা সুখ অনুভব করছি এবং সুখ ভোগ করেও আমরা এগুলি থেকে নির্লিপ্ত থাকি, অর্থাৎ এখান থেকে চলে যাই, পাখা খারাপ হয়ে যায়, বিদ্যুত বিভ্রাট হয় তাহলে তার জন্য কোন রকম চিন্তা হয় না। এর কারণ কী ? কারণ হল মমতার অভাব। যাঁর প্রতি মমতা জাগ্রত হবে, তাঁর জন্য চিন্তা স্বতই শুরু হয়ে যাবে, যার ফলে অশান্তি লেগেই থাকবে। মমতা বজায় থাকলে অশান্তি এবং পুনর্জন্ম লাভ করা ছাড়া অন্য কোনো রকম লাভ হয় না এবং কোনো লোকসানও তখন অবশিষ্ট থাকে না। এই ব্যবসায়ীবর্গ (বৈশ্যজাতি) খুব স্বার্থপর হয়ে থাকে। এরা লোকসানের ধারে-কাছে ঘেঁষে না এবং কেবল লাভ পছন্দ করে। মমতা ত্যাগ করলে কোনো লোকসান হয় না, বরং মমতা বজায় রাখলে শুধুই লোকসান হয়, লাভ

কিছুই হয় না। এইসমস্ত বস্তু আগে ছিল না এবং পরেও থাকবে না। সুতরাং এদের প্রতি শুধু-শুধুই মিথ্যা মমতা পোষণ করলে বার-বার দুঃখ পেতে হবে। এই কথাটা আপনারা অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে এখনই জিজ্ঞেস করুন !

প্রথমতঃ আপনি যাদের নিজের বলে মনে করেন ; যেমন, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি, বাড়ি, শরীর প্রভৃতিকে আপনি নিজের বলে মেনে নিয়েছেন এবং মনে করেন—এরা হল আমার নিজের। ভেবে দেখুন, এরা কি আগে আপনার ছিল ? এরা কি পরে আপনার থাকবে ? এরা আপনার ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ, যার প্রতি আপনি মমতা পোষণ করেন, আপনি কি তার পরিবর্তন করতে পারবেন ? যাকে 'আমার ছেলে' বলে মনে করেন, তাকেও কি আপনি নিজের আজ্ঞানুসারে চালাতে পারবেন ? আপনার শরীরকেও কি আপনার ইচ্ছামতন সুস্থ রাখতে পারবেন ? অন্ততপক্ষে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে কি রক্ষা করতে পারবেন ? আপনার ধন-সম্পত্তি চিরদিন নিজের কাছে রাখতে পারবেন ? সেটা কি আপনার সাধ্যের মধ্যে ? শরীর অসুস্থ হবে, বিনাশও হবে। ছেলেও কথা শুনবে না। ধনও চলে যাবে। মমতা উদ্রেককারী বস্তুদের চিরকাল ধরে রাখার সামর্থ্য কার আছে, বলুন ! এর তাৎপর্য হল এগুলি আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না এবং বর্তমানেও এদের ওপর আপনার কোনো রকম আধিপত্য চলে না। আপনি এদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতেও সমর্থ নন। নিজের অনুকূল করতে সমর্থ নন, রাখতেও সমর্থ নন। এরা আগেও আপনার ছিল না, এবং এদের সঙ্গে বিচ্ছেদ একেবারে নিশ্চিত—এটাই হল প্রকৃত কথা।

প্রতিটি বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আপনি কিছু করলে তাতে সাফল্য আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। কোনো জায়গায় যেতে হবে, কোনো ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হবে। এমন ক্ষেত্রে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতেও পারেন কিংবা নাও পৌঁছাতে পারেন। কারও সঙ্গে দেখা হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। ছেলের বিয়ে তো দিয়েছেন, কিন্তু তার সন্তান হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। এই প্রকার প্রত্যেক

কাজের ক্ষেত্রে 'হতে পারে এবং নাও হতে পারে'—এই ধরনের অনিশ্চয়তা থাকে ; কিন্তু একদিন মরতে হতে পারে, আবার নাও হতে পারে— এই ধরনের বিকল্প কি এই ক্ষেত্রে আদৌ আছে ? মরতে হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে, চাইলে মরতে হবে, না চাইলে মরতে হবে না—এইরকম কি কখনো হতে পারে ? সুতরাং যখন নিশ্চিতরূপে একদিন মরতে হবেই এবং মৃত্যুর পর মমতা উদ্রেককারী সমস্ত বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তাহলে এই আপনত্ববোধ (মমতা) আগেই ত্যাগ করুন। তাহলে ধন্য হয়ে যাবেন। অন্তিমে তো এইসবের বিচ্ছেদ হয়েই যাবে ! কেন বৃথা নিজের সম্মান খোয়াবেন ? অপমান ছাড়া আর কী লাভ হবে ?

আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন যে মমতা ব্যতীত আপনার আত্মীয়-স্বজনদের পালন কেমন করে সম্ভব হবে ? প্রকৃতপক্ষে, মমতা ব্যতীত পালন অধিক সুষ্ঠুভাবে হয়ে থাকে এবং আরো ভালোভাবে হয়ে থাকে। একটি কথা মনে পড়ল। সাধু হোক, অথবা ব্রাহ্মণ হোক, আপনার প্রকৃত মঙ্গল কি মমতা পোষণকারী ব্যক্তি বেশি করতে পারে ; না কি যে ব্যক্তি মমতা পোষণ করেন না, তিনি করতে পারেন ?—এই কথাটা শান্ত মনে একটু ভাবুন। একজন আপনাকে তাঁর শিষ্য করে নিয়ে মনে করলেন যে এ হল আমার শিষ্য। আরেকজন শিষ্য না করে আপনাকে যথার্থ উপদেশ দিলেন। এই ক্ষেত্রে, যিনি আপনার প্রতি মমতা পোষণ করলেন তিনি কি আপনার প্রকৃত হিতকারী, না কি যিনি আপনার প্রতি মমতা পোষণ করলেন না, তিনি—এটি আপনারা নিজেরাই চিন্তা করলে অনুধাবন করতে পারবেন।

যিনি স্বার্থপর তিনি প্রকৃত কথা বলবেন, না কি যিনি নিঃস্বার্থ, তিনি ? কার কথায় প্রভাব পড়বে ? আপনারাও নিজেরা অনুধাবন করতে পারেন যে আপনাদের কল্যাণ কি সম্বন্ধ জুড়লে হয় না কি সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করলে হয় ? মমতা বজায় রাখলে লোকসান ছাড়া কিছুই হয় না এবং মমতা ত্যাগ করলে কেবল লাভই হয়ে থাকে। এটি ভালোভাবে বিচার করে দেখুন।

———○———

ভয় এবং আশার ত্যাগ

প্রশ্ন— আমরা তো সাধন, ভজন, সৎসঙ্গ করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সংসারের প্রভাব কেন আমাদের ওপর পড়ে ?

উত্তর—দেখুন ভাই! আমার কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। সংসারের প্রভাব কার ওপর পড়ে ? এটা গভীরভাবে বিচার করুন। সংসারের প্রভাব কেবল সংসারের ওপরই পড়ে, নিজের স্ব-রূপের ওপর কোন প্রভাব কখনো পড়ে না। কোন কিছুর প্রভাব পড়ল আবার কিছু সময় পর প্রভাব কেটে গেল—এই বোধটি আছে কী নেই ? এর উত্তর দিন।

প্রশ্ন—একটা কথা মনে হয় যে সৎসঙ্গ চলাকালীন বিচারের দ্বারা যেটা আমরা অনুভব করতে পারি, তার প্রভাব কিন্তু পরে আর বজায় থাকে না।

উত্তর— পরে বজায় না থাকুক ! সৎসঙ্গে যথার্থ বলে মনে হয়েছে তো ? আপনি যে পরে এর প্রভাব দেখতে চান, এই ধরণের আগ্রহ পোষণ করাই হল আপনার মস্ত বড় ভুল। এই মুহূর্তে এই ভুলের সংশোধন করে ফেলুন। ব্যবহারকালে অন্তঃকরণের সকল বৃত্তি যেন একরকমের হয়, এই আগ্রহ ত্যাগ করুন। এটি কখনো সম্ভব নয়। কেননা আপনার অন্তঃকরণের বৃত্তি তো ক্রিয়া অনুসারে হবে। যদি অন্তঃকরণে তদনুরূপ বৃত্তি না হয়, তাহলে আপনি কেমন করে কর্ম (ক্রিয়া) করবেন ? ভোজন করা, কথা বলা, হাঁটা-চলা কেমন করে করবেন ? চুপ করে থাকতে চাইলেও, কেমন করে পারবেন ? আপনার ক্রিয়া অনুসারেই অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল চালিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, সক্রিয়তা এবং নিষ্ক্রিয়তা— এই দুইয়ের জ্ঞান আপনার হয়, কি হয় না ? এই দুটি অবস্থার যার বাস্তবিক জ্ঞান হয়েছে, তার জ্ঞানে সক্রিয়তা এবং নিষ্ক্রিয়তা— উভয় অবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞানই বিরাজমান। এই কথাটা অনুধাবন করতে পারলে আপনি ধন্য হয়ে যাবেন।

দুই প্রকার অবস্থা আছে— সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়। উভয়ই হল প্রবৃত্তি।

আপনি হয়ত শুনেছেন যে সক্রিয় অবস্থাই হল প্রবৃত্তি কিন্তু নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রবৃত্তি নয়। প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়—উভয় অবস্থাই হল প্রবৃত্তি। যে নিত্যপ্রকাশের দ্বারা সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় উভয় অবস্থাই প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশ কিন্তু সর্বদা প্রবৃত্তি রহিত। একান্তে সেই প্রকাশকে জানা সম্ভব, কিন্তু সক্রিয় অবস্থায় তা হয় না। কিন্তু জানা না গেলেও ব্যবহারকালে প্রবৃত্তির জ্ঞান কার হয়ে থাকে ? এই প্রবৃত্তির জ্ঞানও তো অনুভূত হয়। তাই না ? অর্থাৎ প্রবৃত্তির জ্ঞাতা থেকে যায়। এই যে নিরপেক্ষ জ্ঞান— এই প্রকাশের মধ্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কোনোটাই নেই। এটি খুবই সহজ সরল কথা যে, যার দ্বারা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কোনোটাই নেই। প্রবৃত্তিও নেই, নিবৃত্তিও নেই। বুঝতে পেরেছেন কী ? আপনাকে এই কথাটি দৃঢ়ভাবে মনে গেঁথে রাখতে হবে। বৃত্তিগুলি যাতে একইভাবে থাকে— এই ধরনের ইচ্ছা বা আশা পোষণ করা আজ থেকেই আমার কথায় ত্যাগ করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আশা পোষণ করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি সন্তোষ লাভ করতে পারবেন না। সুতরাং আজই, (এই মুহূর্তেই) এটা ত্যাগ করুন। সক্রিয় অবস্থাতে যাই হোক না কেন, বাস্তবিক নিত্য বিরাজমান বস্তু তো প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েরই প্রকাশক। তাহলে নিবৃত্তিকে এতটা মহত্ত্ব কেন দিয়ে থাকেন ? বাস্তবিক তো এই প্রকাশ সর্বদা বিরাজমান। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয় যে প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশ হল তত্ত্ব। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয় হল অবাস্তবিক, উভয়ই হল সাপেক্ষ। প্রবৃত্তির দৃষ্টিতে নিবৃত্তি এবং নিবৃত্তির দৃষ্টিতে প্রবৃত্তি আছে। বাস্তবিক যে নিত্য প্রকাশ আছে, তাতে কিন্তু নিবৃত্তিও নেই, প্রবৃত্তিও নেই। কথাটা ঠিক কি না ? এই নিত্য প্রকাশের মধ্যেই তো আপনার (স্বরূপের) প্রকৃত স্থিতি। আমার কথাটা মেনে নিয়ে আপনার মনে যে ভুল ধারণাটা আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ প্রবৃত্তি থাকে এবং তার প্রভাব আমাদের ওপর পড়ে ততক্ষণ আমরা ঠিক থাকতে পারি না— এই ভুল ধারণাটা অবিলম্বে ত্যাগ করুন।

আপনারা এবার মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এই প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির

ত্যাগ কার দ্বারা হয়ে থাকে ? কখনো নিবৃত্তি আসে, প্রবৃত্তি যায়। কখনো নিবৃত্তি যায়, প্রবৃত্তি আসে। কোথায় গেল, কোথায় এল, বলুন। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অভাব হয় কি না ? যদি প্রকৃতপক্ষে অভাব হয়েই থাকে, তাহলে পৃথকভাবে 'কারো দ্বারা' ত্যাগের প্রয়োজন আছে কী ? এই ধরনের আগ্রহ ত্যাগ করুন। কার দ্বারা ? আপনার (স্বয়ং) নিজের দ্বারা। 'এইরকম বৃত্তি সর্বদা বজায় থাকুক'— এই আগ্রহ ত্যাগ করুন। তাতে আপনার বাস্তবিক লাভ হবে। এই কথাটা খুব সহজবোধ্য, কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়ে সর্বদা স্বতঃই প্রকাশিত হয় এবং স্বতঃই প্রকাশিত হতে থাকবে। এতে আপনার কোনো রকম ভূমিকা নেই। এই বিশ্ব-সংসারে সর্বত্র প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির স্ফুরণ হয়ে থাকে কি না ? আপনি তো এটা জানেন যে জাগ্রত অবস্থায় আপনি কাজ করেন, কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় কাজ করেন না। এখন এর জন্য আপনার মধ্যে কোনোরকম পরিবর্তন হয় কী ? বিশ্ব-সংসারে সর্বত্র যে প্রবৃত্তির স্ফুরণ হয়ে থাকে, তার ফলে আপনার মধ্যে কোনোরকম পরিবর্তন হয় কী ? আপনার প্রকাশের অন্তর্গত যে স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ বিরাজ করেন, তাঁর মধ্যে কোনোরকম পরিবর্তন কখনো হয় কী ? অতএব আপনি চিন্তা কেন করছেন ? এই সংসারের যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, সেটা হল আপনার শরীরের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি। সংসার এবং শরীর—উভয় হল একই বস্তু।

প্রশ্ন— সংসারের প্রবাহে প্রভাবিত হওয়ায় সন্তোষ লাভ করতে পারি না।

উত্তর— এটাই তো আপনার ভুল। সন্তোষ কেন লাভ করা যায় না ? কারণ হল যে আপনি নিজের অন্তঃকরণ নির্বিকার অবস্থায় দেখতে চান। এই আগ্রহ আপনি পোষণ করে থাকেন। অন্তঃকরণ কেন নির্বিকার হয় না—এই আগ্রহ ত্যাগ করুন। অন্তঃকরণ নির্বিকার থাকা উচিত—এই আগ্রহও ত্যাগ করুন। অন্তঃকরণ কি করে নির্বিকার থাকবে ? যখন এটা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত এবং প্রকৃতির (কাজের) অংশ, তখন অন্তঃকরণ কী করে নির্বিকার থাকতে পারে ? এতে তো স্বভাবতই প্রকৃতির বিকার হবে।

প্রশ্ন— মহারাজজী ! আপনি তো বলছেন এই আগ্রহ ত্যাগ করতে। কিন্তু ভাবতে ভয় হচ্ছে যে ত্যাগ করলে যদি আমার পতন হয় ?

উত্তর—সেইজন্য আমি বার-বার বলছি যে আমার কথায় এটা ত্যাগ করুন। এই কথাটা কেন বলছি ? কারণ, আপনার মনে যে ভয় আছে, তা আমি জানি। তাই আমি বলছি, আপনি ভয়হীন হয়ে যান। ভয় পাবেন না। যতক্ষণ আপনার মনে আগ্রহ আছে, ততক্ষণ বাস্তবিক স্থিতি লাভ হতে পারে না। এই আসক্তিই হল স্থিতিলাভের একমাত্র প্রতিবন্ধক, এছাড়া অন্য কিছু প্রতিবন্ধক নেই। সেই নিত্য প্রকাশে স্থিতি লাভ হলে আপনার পতন হতেই পারে না। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয়ের মধ্যে এই প্রকাশ সমান ভাবে বিরাজ করে। এই প্রকাশের মধ্যে কোনো পরিবর্তন কখনো হয় কী ? আমাকে বলুন ! যদি কোনোরকম পরিবর্তন না হয়, তাহলে পতন কী করে হতে পারে ? আপনি তো এই আগ্রহ পোষণ করে থাকেন যে অন্তঃকরণ সর্বদার জন্য নির্বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হোক। যদি সত্যিই তা কখনো হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে—

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ (গীতা ১৪।২২)

ভগবানের এই কথাটার কোনো মূল্য থাকে কী ? যদি প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ অন্তঃকরণ থেকে চিরতরে মিটে যায়, তাহলে ভগবান **'ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি'** এই কথাটি কেন বলছেন ?

প্রশ্ন—মহারাজজী ! এই কথাগুলি তো কেবল সেই সব মহাপুরুষদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যাদের ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়ে গেছে।

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে আমরা সবাই হলাম সেই সব মহাপুরুষ। সেই সব মহাপুরুষ কিন্তু আলাদা কেউ নন। আমরা তো সবাই মহাপুরুষ। এই নিত্য প্রকাশের নামই মহাপুরুষ। আপনারা ভয় পাবেন না, ভয়ের কোনো কারণ নেই। এই যে সর্বব্যাপী সামান্য প্রকাশ, এই স্থিতিকেই তো মহাপুরুষ বলা হয়ে থাকে। মহাপুরুষ বলুন অথবা চাইলে ব্রহ্ম বলুন, এই প্রকাশের মধ্যে কিন্তু কোনো রকম তারতম্য হয় না। এই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম এক ও অনন্য।

সুতরাং, প্রথমতঃ আপনারা ভয় ত্যাগ করুন ; এবং দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যতে আপনার কিছু বিশিষ্টতা লাভ হবে—এই আশা ত্যাগ করুন। এই দুটিই হল প্রকৃত বাধা, তাই এগুলি অবিলম্বে ত্যাগ করুন।

নিষিদ্ধ আচরণের ইচ্ছা হয়ে থাকে। নিষিদ্ধ আচরণ কখনো করার ইচ্ছা জাগলেও সহজেই বিদূরিত হবে। এটা শুনে আপনি হয়ত ভয় পাচ্ছেন। নিষিদ্ধ আচরণ ত্যাগ করার কথা ভাবলে যদি আপনার মনে ভয় হয়, তাহলে এটাই সিদ্ধ হয় যে আপনি নিজেই নিষিদ্ধ আচরণকে মহত্ত্ব বা গুরুত্ব প্রদান করেছেন। মহত্ত্ব প্রদান করার পর আপনি ত্যাগ করতে চাইলেও কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবেন না, কারণ আপনি তো নিজেই সেটিকে আহ্বান করেছেন। অতএব, সেগুলিকে উপেক্ষা করুন। করা, না করা এবং উপেক্ষা করা—এই তিনটি বিকল্প আছে। করার ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিধি সম্মত ক্রিয়া করা উচিত, শাস্ত্র নিষিদ্ধ ক্রিয়া কখনো করা উচিত নয়। কিন্তু ভিতরে বিধি এবং নিষেধ—উভয়ের প্রতি উদাসীন থাকবেন। কারণ বিধি এবং নিষেধ উভয়েই সেই এক প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রকাশের সঙ্গে বিধি নিষেধ কোনোটিরই সম্বন্ধ নেই। বিধির সঙ্গে নিষেধের সম্বন্ধ আছে। বিধির গুরুত্ব হল এই যে তার পালন হলে নিষেধের নিবৃত্তি হয়ে থাকে। এছাড়া বিধির অন্য কোনো গুরুত্ব নেই। **সেইজন্য বিধি-নিষেধ, ভয় এবং আশা—এই দুটিই ত্যাগ করুন**। কথাটা অনুধাবন করতে পেরেছেন কী না ? আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন কী না ? বিধি এবং নিষেধের ক্ষেত্রে বিধির প্রতি লোভ এবং নিষেধের প্রতি ভয় হয়ে থাকে। এই ভয় এবং লোভ যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে, ততক্ষণ কিন্তু আপনার স্বরূপে স্থিতিলাভ করা সম্ভব হবে না। সেইজন্য, ভয় এবং লোভকে কখনো পরোয়া করবেন না। সর্বদা উপেক্ষা করবেন। তার ফলে উভয় ত্যাগ হয়ে যাবে। উপেক্ষা করবেন, কেবল উপেক্ষা। যদি ভয় এসে উপস্থিত হয় অথবা লোভ এসে উপস্থিত হয়, তো আসুক। আমি আপনার বর্তমান আধ্যাত্মিক স্থিতিকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলছি। জনসাধারণের প্রত্যেককে উদ্দেশ্য করে আমি বলছি না। কারণ সকলে তো এর অর্থ

বুঝতে পারবে না, বরং তারা এটির বিপরীত অর্থ বুঝবে। কিন্তু আপনার ওপর এর বিপরীত প্রভাব কখনো পড়বে না, পড়তে পারে না। কারণ এই কথাটা যখন আপনি বুঝে নিয়েছেন যে বিধি এবং নিষেধ— অর্থাৎ, এটা করা উচিত আর এটা করা উচিত নয়, এই দুটিই কখনো অস্তিত্ব লাভ করে এবং কখনো মিটে যায়, এরা কখনো আসে এবং যায় এবং এই আসা-যাওয়াকারী বস্তুর দায়িত্ব নিত্যবস্তুর ওপর কখনো বর্তায় না, নিত্যবস্তুর ওপর কখনো প্রভাব পড়ে না, নিত্যবস্তুর কোনোরকম পরিবর্তন হয় না, নিষেধ অথবা বিধি উভয়ের দ্বারাই নিত্যবস্তুর কোনো রকম লাভ ক্ষতি হয় না, হতে পারে না, হওয়া সম্ভবও নয়, তখন আপনার ওপর এর বিপরীত প্রভাব কেমন করে পড়বে ?

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব সোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।। (গীতা ১৪।২৩)

উদাসীন ব্যক্তি কখনো বিচলিত হন না। তিনি সর্বদা একইভাবে অবস্থান করেন এবং সেই অবস্থা হতে কখনো বিচ্যুত হন না। ভয় এবং আশা—এই দুটিকে ত্যাগ করতে হবে। ভয় এবং আশার বন্ধনে এই সংসার আবদ্ধ হয়ে আছে। কোনো প্রকারের ভয় অথবা আশা কখনো পোষণ করবেন না। যতটা চুপ করে থাকা সম্ভব, চুপ করে থাকবেন। এবং 'হে নাথ ! আমার নিজের দ্বারা ত্যাগ করা সম্ভব হচ্ছে না'—এই প্রার্থনা করবেন। এইটুকু বলতে পারবেন কী না ? যতক্ষণ চুপ করে থাকতে পারবেন, চুপ করে থাকবেন। শরণাগতি এবং চুপ করে থাকার মধ্যে বিশেষ শক্তি আছে। তার ফলে নির্বলের শক্তি লাভ হয় এবং কার্যের সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ আপনার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হবে এবং কার্যে সাফল্য লাভ হবে। আপনার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হবে নির্বিকার হলে এবং সিদ্ধিলাভ হবে শরণাগত হলে। চুপ হলে (অন্তর-বাহিরে অক্রিয় হলে) বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হয়।

এই কথাটা অনুভবসিদ্ধ যে বলতে বলতে অবশেষে একটা সময়ে বলা বন্ধ হয়ে যাবে। চুপ করে থাকলে বলার শক্তি পুনরায় লাভ হবে। অক্রিয়

হলে শক্তি স্বতঃই লাভ হয় এবং সক্রিয়তায় শক্তি নষ্ট হতে থাকে। ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের জন্য যত পরিশ্রম করে কাজ করবেন ততই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। নিদ্রার দ্বারা ক্লান্তি দূর হবে এবং পুনরায় শক্তি লাভ হবে। অক্রিয় হলে যে কাজ করার শক্তি লাভ হয়, এটা তো নিশ্চয় অনুভব করতে পারেন ? সেইজন্য অক্রিয় হলে আপনার শক্তি লাভ হবে এবং 'হে নাথ!' বলে তাঁকে ডাকলে (শরণাগত হলে) আপনার কাজ সিদ্ধ হয়ে যাবে। এটা হল সর্বরোগনিবারক ঔষধ। কোনো সন্দেহ থাকলে বলুন ! অতএব শরণাগত হয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে যান। এটাই হল আপনার প্রকৃত ঔষধ। শরণাগত হওয়ার পর চুপ থাকার জন্য কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। কোনো ক্রিয়া যদি হয় তো হোক, যদি না হয় না হোক। এর সঙ্গে আপনার কোনোরকম সম্পর্ক নেই। আপনার দিক থেকে যেন কোনো ক্রিয়া করা বা না করার প্রতি কোনো রকম আগ্রহ না থাকে। উভয়ের প্রতি উদাসীন থাকবেন। যদি ক্রিয়া হয়, তাহলে হতে থাকুক। তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ যাঁদের বলা হয়, তাঁরা এই উপায় অবলম্বন করে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ করে থাকেন।

———o———

॥ শ্রীহরি ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) 1118 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা
গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে
সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা

(২) 763 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) 1577 শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম খণ্ড)

(৪) 1744 শ্রীমদ্ভাগবত (দ্বিতীয় খণ্ড)

(৫) 1574 সংক্ষিপ্ত মহাভারত (প্রথম খণ্ড)

(৬) 1660 সংক্ষিপ্ত মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)

(৭) 1662 শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

(৮) 556 গীতা-দর্পণ
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৯) 13 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থসহ সরল অনুবাদ।

(১০) 496 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(১১) 1736 গীতা প্রবোধনি

(১২) 1393 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বোর্ড বাইন্ডিং)

কোড নং

(১৩) 395 গীতা-মাধুর্য

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(১৪) 1444 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

(১৫) 1455 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (লঘু আকারে)

(১৬) 954 শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ)

তুলসীদাসের অমরকীর্তি, মূল দোঁহা চৌপাই-এর সরল অনুবাদ।

(১৭) 275 কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(১৮) 1456 ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(১৯) 1469 সর্বসাধনার সারকথা

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

(২০) 1119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(২১) 1305 প্রশ্নোত্তর মণিমালা

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(২২) 1102 অমৃত-বিন্দু

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(২৩) 1115 তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে ?

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

কোড নং

(২৪) 1358 কর্ম রহস্য

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'** — সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(২৫) 1122 মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

(২৬) 276 পরমার্থ পত্রাবলী

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(২৭) 816 কল্যাণকারী প্রবচন

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(২৮) 1460 বিবেক চূড়ামণি (মূল সহ সরল টীকা)

শ্রীমৎ শংকরাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(২৯) 1454 স্তোত্ররত্নাবলী

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(৩০) 1603 উপনিষদ্

(৩১) 1604 পাতঞ্জলযোগ

(৩২) 903 সহজ সাধনা

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সাধন পথের সহজতম দিগ্-দর্শন।

(৩৩) 312 আদর্শ নারী সুশীলা

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(৩৪) 1415 অমৃত-বাণী

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৩৫) 1541 সাধনার দুটি প্রধান সূত্র

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

কোড নং

(৩৬) 1478 মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
বিভিন্ন সাধন-মার্গের নির্বাচিত ২০টি প্রবচনের এক অমূল্য সংগ্রহ।

(৩৭) 1651 হে মহাজীবন ! হে মহামরণ !!
স্বামী রামসুখদাস মহারাজের স্বপ্রসঙ্গের নির্দেশাবলী।

(৩৮) 1306 কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা
কর্ম-তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা।

(৩৯) 955 তাত্ত্বিক-প্রবচন
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
গভীর তত্ত্বের সরলতম ব্যাখ্যা।

(৪০) 428 আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
বর্তমানের অশান্ত পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পুস্তিকা।

(৪১) 296 সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা

(৪২) 1359 পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি

(৪৩) 1140 ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব

(৪৪) 1303 সাধকদের প্রতি

(৪৫) 1579 সাধনার মনোভূমি

(৪৬) 1580 অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়

(৪৭) 1581 গীতার সারাৎসার

(৪৮) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন

(৪৯) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী

(৫০) 1513 মূল্যবান কাহিনী

(৫১) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম

(৫২) 956 সাধন এবং সাধ্য

(৫৩) 1293 আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

(৫৪) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি

(৫৫) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব

(৫৬) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া

(৫৭) 443 সন্তানের কর্তব্য

(৫৮) 469 মূর্তিপূজা

কোড নং

(৫৯) 849 মাতৃশক্তির চরম অপমান
(৬০) 1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা
(৬১) 1742 শরণাগতি
(৬২) 762 গর্ভপাতের পরিণাম ? একবার ভেবে দেখুন
(৬৩) 1075 ওঁ নমঃ শিবায়
(৬৪) 1043 নবদুর্গা
(৬৫) 1096 কানাই
(৬৬) 1097 গোপাল
(৬৭) 1098 মোহন
(৬৮) 1123 শ্রীকৃষ্ণ
(৬৯) 1292 দশাবতার
(৭০) 1439 দশমহাবিদ্যা
(৭১) 1652 নবগ্রহ
(৭২) 1103 মূলরামায়ণ ও রামরক্ষাস্তোত্র
(৭৩) 330 ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৭৪) 1495 ছবিতে চৈতন্যলীলা
(৭৫) 1496 পরলোক ও পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা
(৭৬) 1659 শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম
(৭৭) 626 হনুমানচালীসা
(৭৮) 848 আনন্দের তরঙ্গ
(৭৯) 1356 সুন্দরকাণ্ড
(৮০) 1322 শ্রীশ্রীচণ্ডী
(৮১) 1743 শ্রীশিবচালীসা
(৮২) 1785 ভাগবতের মণিমুক্তা
(৮৩) 1787 মহাবীর হনুমান
(৮৪) 1786 মূল শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয়রামায়ণম্‌
(৮৫) 1795 মনকে বশ করার কয়েকটি উপায় ও আনন্দের তরঙ্গ
(৮৬) 1784 প্রেমভক্তিপ্রকাশ, ধ্যানাবস্থায় প্রভুর সঙ্গে বার্তালাপ
(৮৭) 1797 স্তবমালা
(৮৮) 1835 সত্যনিষ্ঠ সাহসী বালক-বালিকাদের কথা
(৮৯) 1834 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল) ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম
(৯০) 1839 কৃত্তিবাসী রামায়ণ

——— o ———